





আমি বললাম—“অসম্ভব। যে খুনীকে আট বছর আগে ধরা যায়নি—তাকে আর ধরা যাবে না।”

ইন্সপেক্টর বললে—“এই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।”

আমি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললাম—“ওটা তোমার লেখা ডিকশনারির বুলি।”

“বুলি নয়, যুগাঙ্ক,” আমার চোখে চোখ রেখে বললে ইন্সপেক্টর—

“আমার মনোবল। সিদ্ধি সহজে আসে না। প্রত্নতত্ত্বের নানা দিক থেকে অ্যাটাক করতে হয়। প্রত্নতত্ত্ব থাকলে তার সলিউশন থাকবেই। যে প্রত্নতত্ত্বের সমাধান নেই, সেটা প্রত্নতত্ত্বই নয়।”

“ফাইল অফিসিয়ালি ক্লোজড হয়ে গেছে।”

“যাক। যদিও তা করা উচিত নয়। বহু দিন যেতে পারে, বহু মাস যেতে পারে, বহু বছর যেতে পারে। ফ্রেঞ্চ এডিভেল হাতে আসতে পারে।”

বিতর্কে অংশ নেয়নি জয়ন্ত। পুলিশ বিভাগে ও এখন একটা বিশেষ জায়গার পৌঁছেছে। পোটা দেশে খুন খারাপি বেড়েছে। বিশেষ ‘সেল’ তৈরি হয়েছে। ও তার চার্জে আছে। পৃথিবী জুড়ে নানারকম ক্রাইম হয়ে চলেছে। এখন শুরু হয়েছে সাইবার ক্রাইম। কিন্তু মার্জার আজও সব চাইতে

সিরিয়াস ক্রাইম। মার্জার মিস্ত্রি সলভ করতে গেলে দরকার অভিজ্ঞতা, প্রত্যাপনমতিত্ব, জেদ আর জেরা করার কৌশল। জয়ন্ত এই গুণগুলোর অধিকারী। তাই ওর বিশেষ ক্ষমতার জোরে যেখানে খুশি যেতে পারে, ‘মার্জার অফিস’ খুলে বসতে পারে, স্থানীয় পুলিশকে সাহায্য করতে পারে। এতে কাজ হচ্ছে। যদিও প্রেস রিপোর্টে জয়ন্তের নাম কোথাও থাকছে না। সিক্রেট ‘সেল’—এর খবর কেউ জানে না। আরও একটা নাম পাবলিকের অগোচরে রাখা হয়েছে। ইন্সপেক্টর নাম।

বহু কেসে ইন্সপেক্টর ওর পাশে থাকে। হত্যাকারীকে চাই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ যদি তার বুদ্ধি ধার দেয়, ক্ষতি কী? এতে ওপরওলাসের সাম্য আছে। মদত আছে। কারণ, কাজ হচ্ছে।

জয়ন্ত এসেছিল এই মন্তলবেই। সেদিন ছিল রবিবার। বাসিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটার গেহিলাম ইন্সপেক্টর সঙ্গে আড্ডা মারতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল জয়ন্ত। বলল ওর মিস্ত্রিয়াস কেস—কাহিনী। ব্যাপারটা এই:

[২] গ্রিনটাউন শহরের রহস্য

‘গ্রিনটাউন’ একটা ছোট শহর। আয়তনে ছোট হলেও বড় শহরের খুদে সংস্করণ। পুলিশ বীড়ি নতুন বাড়িতে গেছে। দারোগা অভয়ঙ্কর তলাপাত্র জয়ন্তকে নতুন অফিস দেখাচ্ছে। কারণ, এটা এখন ‘মার্জার অফিস’ও বটে। সে প্রশ্ন এখনও তোলেনি অভয়ঙ্কর তলাপাত্র। বয়স চল্লিশ দুই-দুই। গাত্রবর্ণ অমানিশা প্রতিমা। চকু যুগল সদা রক্তবর্ণ। গৌর মিসিটারি ধাঁচের। মাথায় পাক্কা হুঁট। মেদহীন। প্রকৃত ব্যায়ামধীর।

প্রথম আলোপেই জয়ন্ত বলেছিল—“যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা প্রস্তাব রাখব।”

শশব্যস্ত হয়ে অভয়ঙ্কর তলাপাত্র বলেছিল—“একটা কেন, স্যার, একশটা রাখুন।”

“আপাতত একটা। আপনার নামটা বড় বড়।”

“আজ্ঞে, বাবার দেওয়া নাম।”

“আমি যদি একটু ছোট করে নিই, আপত্তি করবেন?”

“একদম না। এটা তো ‘মিনি’র যুগাঙ্ক।”

“নামটার মুড়ো আর ল্যাজ কটা?”

“স্বচ্ছন্দে। তাহলে কি দাঁড়াল?”

“ভয়ঙ্কর পাত্র।”

এই কাহিনীতে এখন থেকে তাকে শুধু ভয়ঙ্কর পাত্র বলা হবে।

ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—“স্যার, আর তেমন ঘর তো নেই। তাই একটা ঘরেই দুজনের অফিস করলাম।”

“উত্তম কাজ করেছেন। ফনিটারগুলো সেইভাবেই সাজিয়েছেন দেখছি।”

“যাতে দুজনেরই কাজের সুবিধে হয়।”

“এলাহি কাণ্ড করেছেন মিস্টার ভয়ঙ্কর পাত্র।”

“স্যার, আপনিই করিয়ে দিলেন।”

“যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে যে।—ওটা কী করছেন?”

ভয়ঙ্কর পাত্র একটা রঙের তোবড়ান টিনের ট্রাক হাতড়াচ্ছিল। বদখত বস্ত্রটা এ ঘরে মানাচ্ছে না। এখানে সব কিছু মডার্ন—ওই ট্রাকটা ছাড়া। পুলিশের ট্রাক, নথিপত্র রাখা হত। তালা দেওয়া থাকত।

অদীশ বর্ধন

আট বছর  
করে

“বুজি”, বলতে বলতে ট্রাকের একদম তলা থেকে এক ব্যক্তি ফাইল বের করল ভয়ঙ্কর পাত্র। কোণের টেবিলে রাখল, ফাইল তো নয়, চিত্রশুল্কের জবদা খাতা। বেশি খুজতে অবশ্য ছিল না। ওপরেই রাখা ছিল বিশেষ সেই ফাইল। তুলে নিয়ে রাখল জয়ন্তর টেবিলে।

জয়ন্ত বললে—“এর মধ্যে কী আছে?”

ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—“আনফিনিশড বিজনেস”

“অর্থ?”

“সহসা মৃত্যু। জগৎপুরে। আট বছর আগে। তখন আমি গ্রিনটাউনে। বদলি হয়েছিলাম। আবার এসেছি।”

“রহস্যটা কোথায়? কেস অসমাপ্ত কেন?”

“কে খুন করেছে জানা যায়নি, কিভাবে করেছে জানা যায়নি, কেন করেছে তুও জানা যায়নি।”

“যানি বিজনেস।”

“ইয়েস, স্যার।”

ফাইল নিয়ে বসল জয়ন্ত।

‘গ্রিনটাউন’ শহরের অতীত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে পাতায় পাতায়। খুঁড়ে খুঁড়ে হরফে, কিন্তু সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে তদন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হয়েছে। ‘গ্রিনটাউন’ তখন মাথা চাড়া দিচ্ছে। পুলিশের হাতে সময় ছিল যথেষ্ট। তাই এমন হরফ-চিত্র রচনার সময় পাওয়া গেলি। জয়ন্তর চোখ চলল ঝটিকাবেগে। পড়ছে আর ভাবছে, আগের ‘গ্রিনটাউন’ আর এখনকার ‘গ্রিনটাউন’—এ কতই না তফাত। সময় সব কিছু পালাতে দিয়ে যায়।

ফেলে আসা গজকঙ্কপের যুগ পেরিয়ে আসতে হয়েছে জয়ন্তকেও। তখন এত মোটর গাড়ির চোখ ধাঁধানো ছুটোছুটি ছিল না। পবনবেগে খেয়ে যাওয়ার উপযুক্ত এত মোটর রাস্তাও ছিল না। এত অমণবিলাসী ছিল না। পথের পাশে এত সুরার দোকান ছিল না। মধুমক্ষিকার এত সুলভ আর সহজলভ্য ছিল না। নামগোত্রহীন যে কোনও বুনী এখন কয়েক পেগ খাইয়ে মনের মতো দারীকে, সেই দারীরই ইচ্ছায়, গাড়িতে চাপিয়ে উঠাও হয়ে যেতে পারে। তারপর লাশ ফেলে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। সন্দেহভাজনদের লিষ্ট আছে বটে পুলিশের কাছে। লম্বা লিষ্ট। কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার সাসপেন্ডেড নাম। তাদের মধ্যে থেকে কুলোঝাড়া দিয়ে আসল বুনীকে বের করা আর খড়ের গাশায় ঝুঁচ খোঁজা একই ব্যাপার।

কুস্তলা শীল মেয়েটার ক্ষেত্রে প্রায় তাই ঘটেছে। সে খুন হয়েছে। কারা তাকে খুন করতে পারে, পুলিশের তা জানা আছে। কুস্তলাকে দেখতে ভাল, রোজগার করত ভাল, এমন কি শাশু করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফিয়ারি গাড়িও কিনেছিল। নিজে ড্রাইভ করত। এ যুগের হাওয়ায় মানুষ। স্বনির্ভর হতে চেয়েছিল। হয়েছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। ঢিলেঢালা শাড়ি ছিল তার দু’-চক্ষের বিষ। পার্সোনাল সেক্রেটারি হতে গেলে চেহারা যতখানি চেকনাই প্রয়োজন, সবই তার ছিল। বয়কট চুল, গলায় পেঁচানো স্বাক্ষর। গ্রীবা বেকিয়ে কথা বলা। বকমকে অপাঙ্গ চাহনি। অনাড়ম্বর মেলোমেশা। প্রয়োজনে মদিরা সেবন করা। তারপর উদ্দাম নাচে পুরুষ সঙ্গীদের নাচিয়ে দেওয়া।

এইভাবেই কেটেছিল তার জীবনের এক শেষ রবিবারের সন্ধ্যা। ডিনার পার্টি মাতিয়ে দিয়েছিল ছেলে বন্ধু আর মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে। রাত ন’টায় বেরিয়ে গেছিল গাড়ি হাঁকিয়ে। পিভুগৃহের সদর দরজার এক মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

পরের দিন ভোর চারটের সময়ে এক লরি ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করতে গিয়েছিল নিরিবিচি একটা রাস্তায়। সে সময়ে এ রাস্তায় সন্দের পর থেকে ভোর পর্যন্ত গাড়ি প্রায় চলত না বললেই চলে। অথচ অত ভোরে একটা গাড়ি পাঁড়িয়েছিল পার্কিং—এর জায়গায়। ছোট গাড়ি। কিন্তু বাঁ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ফলে জায়গা নিয়েছিল অনেকটা। পার্কিং—এর নিয়ম তো এরকম নয়। একপাশে শুছিয়ে গাড়ি রাখতে হয়। কিন্তু পুঁচকে এই গাড়ি সে-সব গোছগোছের ধার ধারেনি। সাঁ করে ঢুকলেই যেন ঘাঁচ করে ব্রেক মেরেছে। পার্কিং স্পেস—এর ঠিক মাঝখানে, বড় লরি ঢোকানোর জায়গা কোথায়? লরি ড্রাইভারের মেজাজটা খিঁড়ে গেছিল এই কারণেই। এমনতেই সারা রাত ড্রাইভিং—এর ফলে মাথা গরম, শরীর ক্লান্ত। ভোরের আলো ফুটতেই প্রকৃতির আহ্বান তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাই পার্কিং স্পেস দেখে লরিটাকে শুছিয়ে রাখতে গেলি। পুঁচকে গাড়ির বেখান্না পার্কিং দেখে গরম চোখে

সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেয়েছিল, ড্রাইভারের আসনে কে যেন বসে রয়েছে।

লরিতে বসেই গলার শির তুলে টেচিয়ে গেছিল ড্রাইভার। খুঁদে গাড়িটাকে একটু পাশ করে রাখলেই তো হয়। বড় লরিটা তাহলে একটু জায়গা পাবে। কিন্তু খুঁদে গাড়ির চালক কণ্ঠশাপ্ত করেনি।

স্পর্ধা তো কম নয়। লাফিয়ে লরি থেকে নেমেছিল ড্রাইভার। হনহনিয়ে গেছিল লিটল ফিয়ারিটের দিকে।

দূর থেকেই দেখেছিল, চালকের আসনে বসে রয়েছে একটি মেয়ে।

এত ভোরে? বয়স কম, দেখতেও ভাল। হয়তো হাওয়া খেতে

বেরিয়েছে, অথবা গাড়ি চালান শিখতে বেরিয়েছে।

কিন্তু তা তো নয়। গাড়িতে ‘L’ স্টেট কুলছে না। ড্রাইভিং শেখানোর জন্যে অন্য কেউ বসেও নেই। মেয়েটা একা রয়েছে গাড়ির মধ্যে—স্টিয়ারিং—এর সামনে। এত হাঁকডাকও যখন কানে যায়নি, তখন নিশ্চয় ঘুমচ্ছে। গায়ে জড়ানো রয়েছে কিন্তু ফিনফিনে একটা রেনকোট। ফাঁকা রাস্তার জোর হাওয়া জানলা দিয়ে ঢুকে পতপত করে ওড়াচ্ছে রেনকোটের হেডক্যাপ—যা এলিয়ে রয়েছে পিঠের ওপর।

শীতে মরে যাবে যে। আশ্চর্য মেয়ে তো! জানলার কাচটা পর্যন্ত নামিয়ে রেখে অঘোরে ঘুমচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডায়।

উইভক্সনে আতুলের গিট ঠুকতে গেছিল লরি ড্রাইভার—মেয়েটার ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

কিন্তু থমকে গেছিল।

মেয়েটার দু’চোখের পাতা পুরো খোলা রয়েছে।

লরি ড্রাইভার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, পুলিশের কাছে, তা ছোট করে লেখা ছিল রিপোর্টের তলায়। জয়ন্ত তা পড়ে নিল। হারপ্পর তুলল মেডিক্যাল রিপোর্ট—এর কপি।

হাট্ অ্যাটিকে মারা গেছে কুস্তলা শীল। আগের মেডিক্যাল হিসাবিতে রয়েছে তারই আভাস। হৃদযন্ত্র ছিল কমজোরি।

হাট্ অ্যাটিক? ডুক কুঁচকে গেছিল জয়ন্ত। তাহলে ভয়ঙ্কর পাত্র—এ—কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? পুরোনো ফাইল বঁটার কী নরকার ছিল?

চব্বিশ বছর বয়সে হাট্ অ্যাটিক যদিও একটা বিরল ঘটনা। কিন্তু দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়ে অনেককেই তো ভুঁমিট হয়। ভগবান তাদের মেরে রাখেন। কুস্তলা শীল মেয়েটাও নিয়তির ডাক শুনে পরপারে চলে গেছে। পুলিশ তা নিয়ে মাথা ঘামান না—ডাক্তাররা ঘামায়। অদ্বুত কেস পুঁচতে জমিয়ে রাখে। পুলিশ ফাইল ফ্রোজ করে দেয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশের টনক নড়েছিল।

কারণ, কুস্তলা শীলের মাথার বাঁ দিকে দেখা গেছে একটা গভীর চোট। খুলিতে চোট। খুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো বড় চোট নয়, তবে রক্ত করেছিল ভালই।

মাথার বাঁ দিকে...

সেদিকে একজন প্যাসেঞ্জার বসে থাকার কথা।

ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—“স্যার, খটকাটা এইখানেই।”

জবাব না দিয়ে জয়ন্ত অনড় চোখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল ভয়ঙ্করের লাল চোখের দিকে। পুলিশকে নিয়ে হাসিতামাশা সবাই করে। শার্লক হোমস থেকে আরম্ভ করে এখনকার সব গোয়েন্দা লেখকরাই। ভয়ঙ্কর পাত্র একাই এদের চোখ বুলে দেওয়ার পক্ষে যেতে।

মুখ খুলল তারপর—“মাথার বাঁ দিকে চোট। হাট্ অ্যাটিকের আগে না পরে? আলোচনা করা যাক নিজেদের মধ্যে। ও—কে?”

“ও—কে, স্যার। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে করে যাওয়া রক্তের পরিমাণটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে।”

“কারেন্ট। সময়ের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে এইখানেই। রক্ত ঝরেছিল হাট্ অ্যাটিকের আগে, না, পরে?”

“হাট্ অ্যাটিকের পরে যদি ঝরত, এত ঝরত না। অ্যাটিক আরম্ভ হতেই এলোপাড়াভাবে পার্কিং করছে কুস্তলা শীল। সেই সময়ে মাথার বাঁ দিকে টোকর লেগেছে কোনও একটা জায়গায়।”

“গাড়ির মধ্যে মাথার বাঁ দিকে কী ছিল—রক্ত ঝরিয়ে দেওয়ার মতো?”

“ড্রাইভিং মিরর।”

“হাট্ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। কুস্তলা শীলের ধড়ে তখন প্রাণ নেই। প্রাণটা যাওয়ার আগে ব্রেক কবেছিল। মাথা ঠুকে গেছিল। রাইট?”

“ইয়েস, স্যার। হার্টের পাম্পিং যখন বন্ধ হয়ে গেছে, এত রক্ত খরবে কেন?”

“বাঃ। চমৎকার ভেবেছেন। রক্তের পরিমাণটা যখন বেশি তখন সোজা যুক্তি বলছে, মাথায় চোট লেগেছিল আগে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল পরে। রাইট?”

“আই স্যার।”

“ইয়াকি চড়ে কথা বলবেন না। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই: মার্ডার করা হয়েছিল কুন্তলা শীলকে.....”

“মেডিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু সাইলেন্ট থেকেছে মার্ডারের ব্যাপারে।”

চোখ নামাল জয়ন্ত, খুঁটিয়ে পড়ল মেডিক্যাল রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ। ডাক্তাররা অনেক সময়ে জেরা এড়ানোর জন্য সাঁটে মেরে দেয়। এ কুল ও কুল দু'কুলই বজায় থাকে। যুব সাধু যে জানো লক্ষণ।

এই রিপোর্টেও তাই করা হয়েছে। অশ্বখামা হত ইতি গজ'র মতো একটা ব্যান রয়েছে। ব্যানটা জয়ন্ত একবার পড়ল, দু'বার পড়ল, তিন বার পড়ল। তারপর জিজ্ঞাস করল ডয়ঙ্কর পাত্রকে—“কুন্তলা শীল ডাইভিং সীটে কিভাবে বসেছিল? আরামে, না, কষ্টকর অবস্থায়? অত রিপোর্ট পড়বার সময় নেই। আপনি বলুন। গাড়ি পার্ক করার পর তার সিটিং পজিশন কিরকম ছিল?”

“নাইস অ্যান্ড কমফোর্টবল।”

“চমৎকার, হার্ট অ্যাটাক ডগবানের অবদান—মানুষের হাত নেই। কিন্তু ডগবান এই ব্যাপারে বড় নিষ্ঠুর। মোটরিস্টকে ধীরে সুস্থে গাড়ি পার্ক করার সময় সেন না। মাঝ রাস্তা থেকে গাড়ি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর ড্রাইভারের হার্ট অ্যাটাক ঘটান না।”

“ইয়েস, স্যার।”

“থ্যাংকিউ। ইয়াকি বুলিটা তাহলে ছাড়তে পারলেন। নাউ, মিস্টার পাত্র, ডক্টর এইখানে,” মেডিক্যাল রিপোর্টের এক জায়গায় আঙুল রাখাল জয়ন্ত—লিখেছেন, বডি সরানো হয়েছিল মৃত্যুর কিছু পরে।”

ডয়ঙ্কর পাত্র মিলিটারি গৌঁফে তর্জনী সজলন করে বললে—  
“ইন্টারেস্টিং।”

“কুন্তলা শীল—এর কেস খোরাল হয়ে উঠছে ঠিক এই পয়েন্ট থেকেই।”

এই বলে, আরও দুটো স্টেটমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল জয়ন্ত। কুন্তলা শীল—এর মা আর বাবার দেওয়া দুটো স্টেটমেন্ট। দুজনেই একই গাণ্ডনা গেয়েছেন। তাঁদের কন্যার মৃত্যু মোটেই ‘ইন্টারেস্টিং’ নয়, অথবা খোরাল নয়।

দুটো স্টেটমেন্টই আর একটা ব্যাপার সম্পৃষ্ট হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর কেউই ‘ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার’ এর মানুষ নন। সাধারণ দম্পতি। তাঁদের কন্যাও আর পাঁচটা মেয়ের মতো সাধারণ—সমাজে মিশে যাওয়ার মতো মেয়ে—সমাজ থেকে ছিটকে যাওয়ার মতো মেয়ে নয়। কুন্তলা শীল তাঁদের কাছে প্রকৃতই একটা রত্ন। বাড়িতে ঝুট খামেলা বাধায়নি কক্ষনও। বাড়ির বাইরেও কারও সঙ্গে লটফট ব্যাপার ঘটায়নি। শুভ গার্ল। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে। মানিয়ে নিতে পারে। তাই সবার চোখেই সে ভাল মেয়ে থেকেছে বরাবর। হার্ট খারাপ ওর ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু চালিয়ে তো যাচ্ছিল। না, ওষুধপত্র কখনও খায়নি।

রবিবার রাতের ডিনার পার্টির কথাই ধরা যাক। পার্টি দিয়েছেন খোদ বস। বড়লোক। বড় ব্যবসার মালিক। বাড়িটাও একটা প্রাসাদ। শহরের বাইরে। সেখানেও তো যুবরোচক কিছু ঘটেনি। আরও চারজন গেই হাজির ছিল ডিনার পার্টিতে। বিজনেসের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ এসেছিলেন তাঁর গালফ্রেওকে নিয়ে। অন্য একটা বিজনেসের জুনিয়র এক্সিকিউটিভও এসেছিলেন তাঁর বাগদত্তাকে নিয়ে। মোট ছ'জনের পার্টি। কুন্তলা শীলকে বাদ দিলে থাকে পাঁচজন। পাঁচজনের মধ্যে চারজনের স্টেটমেন্টই এক রকম। অঞ্জনার স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়নি।

কুন্তলা শীল এসেছিল সাতটার।

ডিনার খাওয়া শুরু হয়েছিল ঠিক তারপরেই।

টেবিল সাফ হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল কুন্তলা। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ থেকে যেতে হয়েছিল বস—এর অনুরোধে। পরের দিন সকালেই তাঁকে যেতে হবে বিজনেস ট্রিপে। তাই কয়েকটা চিঠির ডিকটেশন দিয়েছিলেন কুন্তলা—কে।

তারপরেই, শিটহ্যান্ড নেটবুক ব্যাগে রেখেছিল কুন্তলা। ব্যাগ নিয়েই

এসেছিল পার্টিতে। খান কয়েক বিল পেমেট করা বাবদ চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন বস। এই টাকাও ব্যাগে রেখেছিল কুন্তলা।

বেগিয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

তখন প্রায় রাত নটা।

তারপর তাকে জীবিত অবস্থায় এই চারজনের কেউই আর দেখেনি।

হ্যান্ডব্যাগ রহস্য শুরু হয়েছে এইখান থেকেই।

কারণ, এই বস্তুটিকে কেউ আর দেখেনি।

হ্যান্ডব্যাগ। জয়ন্তর মনচক্ষে ভেসে উঠল জিনিসটা। সব মেয়ের কাছেই এই একটি বস্তু বড় প্রিয়। এবং নিত্যসঙ্গী। চশমাধারী যেমন চশমা ছাড়া হলেই বুঝতে পারে, কী যেন হারিয়ে গেছে। মেয়েরাও হ্যান্ডব্যাগ কাঁধে অথবা হাতে না রাখলে নিজস্বের খুবসরত মনে করে না। হ্যান্ডব্যাগ। ওরফে, ভ্যানিটি ব্যাগ। তর্জমা করলে দাঁড়ায়, দস্ত থলি। মেয়েদের দস্ত। এ যুগের কোমলাঙ্গীরা তো নিবিড় বস্তু থেকে আরক্ত করে প্রসিদ্ধ বস্তু পর্যন্ত সব কিছুই স্থান করে নেয় এই বটুরার মধ্যে। বস্তুটা তাদের হিতীয় হৃদয়। কুন্তলা শীল মডার্ন গার্ল। ইয়াং। চার্মিং। স্মার্ট। ড্যাশিং পুশিং। শীতিবোধের নিগড়বদ্ধ নয়। নিত্যসঙ্গী দস্ত—বটুয়া নিয়ে গেছিল ডিনার পার্টিতে। অবশ্যই নিজেকে ফ্রেশ আর অ্যাট্রাক্টিভ রাখার জন্যে। খানাপিনা অঙ্গে নেটবুক আর টাকার বাড়িল হ্যান্ডব্যাগের উদরে প্রবেশ করিয়ে পার্টিস্থল ত্যাগ করেছিল।

তারপর যখন তাকে দেখা গেল, শুধু তাকেই দেখা গেল, নিত্যসঙ্গী দস্ত—বটুকা বৃষ্টি পঙ্কডুতে বিলীন হয়ে গেছে।

সেই সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে আরও একটা বস্তু।

স্বার্থ।

আলট্রামডার্ন ড্রেস পরে পার্টিতে গেছিল কুন্তলা শীল। হ্যান্ডব্যাগের মতোই নিত্যসঙ্গী আর একটা বস্তুকে গলায় বাহারি বন্ধনে কুলিয়ে রেখেছিল। তার স্বার্থ। রেশমি স্বার্থ। বাটিকের কাজ করা। চোখ কাড়ে সবার আগে। নারী বরতরতে পুরুষের পোশাক তার পয়লা ফ্যাশন। দোসরা ফ্যাশন এই স্বার্থ—নেকটাইয়ের বিকল্প।

স্বাস্থ্য আসর থেকে যখন সে বিদায় নিচ্ছে (অবশ্যই হাসাখরা ললিত ভঙ্গিমায়), তখন তার চারুদ্রীবা বেষ্টন করেছিল এই স্বার্থ।

স্বার্থ কালেকশন তার হবি। ছেলেদের নেকটাই কালেকশনের মতো নিত্য পরিবর্তন ঘটত। চোখ ধাঁধানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল নিখুঁত নিষ্ঠায়।

তাই সেই বিশেষ রবিবারের বিশেষ স্বার্থ কী ধরনের ছিল, তা জলছবির মতো ছাপ মেরে গেছে সন্তুষ্টবস্তির মনের পটে।

এই সাতজনের মধ্যে রয়েছেন কুন্তলার পিতা—বৃগু আর জননী—জন্মভূমিক্ত; রয়েছেন অন্নদাতা—বস; রয়েছেন স-বাগদত্তা এক এক্সিকিউটিভ এবং স-বান্ধবী আর এক এক্সিকিউটিভ।

সাতজনেই দেখেছেন সেই সন্ধ্যার কণ্ঠ—আকর্ষণীয় বস্তুটাকে।

প্রত্যেকেরই মনে ছিল সেদিনের স্বার্থটা ছিল কী ধরনের, কী রকম নকশার। বাটিকের কাজ করা। গাঢ় লাল আর ফিকে কালো রঙের সংমিশ্রণ শুধু বর্ডারে। বাকিটা ময়ূরকণী বর্ণের।

এমন জিনিস একবার দেখলে টক করে ভোলা যায় না।

কুন্তলা শীলকে ডিনার পার্টির পর সজীব সহাস্য অবস্থায় আর দেখেনি এই পাঁচজন।

কিন্তু পাঁচজনেরই মনের পরতে পরতে গেঁথে গেছিল নয়নসুন্দর স্বার্থের ছবি।

এই চার ব্যক্তির মধ্যে আবার শুধু তিন ব্যক্তির সম্পৃষ্ট মনে আছে, রাত প্রায় নটার সময়ে যখন কুন্তলা শীল নারী বিদ্যুৎবল্লরী বিদায় নিচ্ছে ডোজনকক্ষ থেকে, তখন তার কণ্ঠদেশে বেষ্টন করেছিল আশ্চর্যসুন্দর সেই স্বার্থ।

কুন্তলা অলঙ্কারপ্রীতি কক্ষনও দেখাত না। তাতে নাকি নিজেকে বড় মেয়েলি দেখায়। নারী পুরুষের অশন যখন এক, বসন এক থাকবে না কেন? গলায় তাই চজ্ঞাহারের পরিবর্তে থাকত এই স্বার্থ।

এবং, স্বার্থ—স্বলক দেখিয়েই খানাপিনার কক্ষ থেকে বিদায় নিয়েছিল কুন্তলা। তিনজন তা দেখেছে। তিনজনেরই তা স্পষ্ট মনে আছে।

শুধু তিনজন।

পরেটটা মাথার মধ্যে রাখল জয়ন্ত।



“হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ,” বললে ডায়র পাতকে— “নিখোঁজ এই দুটি জিনিস উদ্ধারের জন্যে খানাত্তাসি কী কী হয়েছে? আরে মশায়, অত রিপোর্ট পড়া যায় নাকি? পড়ব, পরে পড়ব। আপনি চূড়কটুকু শুনিয়ে দিন।”

গলাখাঁকি দিয়ে ডায়র পাত বললে— “তাহলে স্যার, শুধু এই স্কেচ মাপগুলো দেখুন। কোন কোন জায়গা কভার করা হয়েছে—সব দেখানো হয়েছে—”

“দেখলাম। কিন্তু স্কার্ফ আর হ্যান্ডব্যাগ পেলেন না?”

“পেলায় রাশি রাশি স্কার্ফ আর হ্যান্ডব্যাগ। শুধু ওই দুটো ছাড়া। ছেলেদের তো স্যার একটা মানিব্যাগ হলই চলে যায়, মেয়েরা এত হ্যান্ডব্যাগ কেনে কেন?”

“গিরি কাকে বলে এখনও তা জানেন না। আপনার কথাই তার প্রশ্ন।”

“আজ্ঞে ওই পাঠশালায় পড়িনি। গিরি নিয়ে পুলিশের চাকরি করা যায় না।”

কথটা মনে ধরল জয়স্বর। গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করেও থাকতে পারল না। ফলে, একটা উদ্ভট হাস্যরসেখা জাগ্রত হল টেবিলের দুই প্রান্তে।

বলল— “একই তরঙ্গের যাত্রী আমরা দুজনই। পুলিশ গিরিরে অবস্থা বড় করুণ হয়ে দাঁড়ায় যখন প্রমোশন পেতে থাকে পুলিশ বাহিনী। যাক এই সব ছেনো কথা। অনেক হ্যান্ডব্যাগ, অনেক স্কার্ফ উদ্ধার করলেন খানাত্তাসি করে এই—এই জায়গা থেকে।” স্কেচ-মাপের ওপর আঙুল রেখে চালিয়ে গেল জয়স্বর— “পেলেন না শুধু সেই ময়ূরকর্তী স্কার্ফ আর নিশ্চয় মানানসই হ্যান্ডব্যাগ—”

“ঠিক ধরেছেন, স্যার। হ্যান্ডব্যাগটাও ছিল ময়ূরকর্তী বাটিক দিয়ে ম্যাক করানো। ট্রেট ছিল কুস্তলা শীল মেয়েটার।

“খুবই বাতাবিকা। যা ধুঁজিয়েছেন, তা পাননি। কেন পাননি, সে সম্পর্কে কী-কী অনুমান খাড়া করেছেন, আদৌ করেছেন কী?... ”

“স্যার, রিপোর্টে লিখে রেখেছি। কাউন্সিল যদি একটু পড়েন—”

“রিপোর্টার যখন সামনে—”

“তাহলে আমিই বলছি। তবে একটু গল্প করে বলব।”

এই বলে একটা কথার ছবি উপহার দিল ডায়র পাত। অনুমানভিত্তিক ছবি। স্নেহ থিওরি।

হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ উধাও হয়ে যেতে পারে যেভাবে, তার মনগড়া কাহিনী...

### [৩] একটি বিগিরিত্তিক কাহিনী

কুস্তলা শীল হাওয়া গাড়িতে চেপে বেরিয়েছে রাত নটা নাগাদ। রাস্তায় এখন গাড়িবোড়া কম। লোকজনও কম। শীতের রাত। হিমেল হাওয়া। বিরবিরে বৃষ্টি। রেনকোটটা তাই হয়ে জড়িয়ে নিয়েছিল বস—এর সদর দরজা থেকে পার্কিং-স্পেসে রাখা ফিয়ার্ট-এর কাছে যাওয়ার জন্যে। আর খোলেনি, ঝড়ের বেগে উড়ে যাবে স্বপ্নে। গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাবে। এই শীতে ডিজতে ইচ্ছে করে না।

জনহীন রাস্তা কিন্তু পুরো জনহীন নয়। সোকাণপট বন্ধ হয়ে গেছে। স্ট্রিটল্যাম্পগুলো তাদের ডিউটি করে যাচ্ছে। একটা বাতিস্তরের তলায় দাঁড়িয়ে এক পুরুষ মূর্তি। আশুমান ফিয়ার্টকে দেখেই নেমে এল রাস্তায়। গায়ে বর্ষাতি। মাথায় ক্যাপ। হাত তুলে ফিয়ার্টকে রুখতে চাইছে।

হেডলাইট জো ছলছিলই। এবার ফগ-লাইট ছেলে দিল কুস্তলা। জনহীন রাত্রে কেউ যদি লিফট নিতে চায়, তাকে চলন্ত অবস্থাতেই দেখে নেওয়া সমীচীন। যুবতীদের বহু দিক ভাবতে হয়। চেনা মুখ হলে গাড়ি বাঁড় করাবে। অচেনা মুখ হলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু লোকটা যেভাবে রাস্তার মাঝে চলে এসেছে, পাশ কাটাওয়ার জায়গা কোথায়? অতলব সুবিধের মনে হচ্ছে না। দরকার হলে থাকাই মারবে কুস্তলা। শব্দ হয়ে ওঠে চোয়ালের রেখা।

ফগ লাইট বিরবিরে বৃষ্টি ভেদ করে আলোক বন্যায় ভাসিয়ে দিল লোকটার মুখ। অবসান ঘটিয়ে দিল কুস্তলার উৎকর্ষ।

চেনা মুখ। খুবই চেনা মুখ।

ব্রেক কবল কুস্তলা।

বললে— “এত রাত্রে? কোথেকে এলে? কোথায় যাবে?”

“একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন,” বললে নির্জন পথে পথচারী— “আগে গাড়িতে উঠি। তারপর বলছি,” বলে, ফগ-লাইটের সামনে থেকে সরে গিয়ে কুস্তলার বাক্যের দরজা খুলে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে— “আসছি এয়ারস্ট্রিপ থেকে। এসেছি কোম্পানির P68C সিট্রিটার এয়ারক্রাফটে। যাব বাড়ি—জগৎপুরো।”

কুস্তলা জানে, ইতিমধ্যে এখন প্রায় পাঁচশ ছোট এয়ারস্ট্রিপ আছে।

‘গ্লিনটাউন’-এর কাছে একটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। এখন বড় বড় কোম্পানিরা তাদের নিজস্ব বিমান নামায়। পথচারী পুরুষ বড় কোম্পানির বড় অফিসার। আর এই সব মহলেই তো সুন্দরী কুস্তলার দহরম মহরম বেশি।

গাড়ি গিয়ারে দিতে যাচ্ছে কুস্তলা, এমন সময়ে পাশের পুরুষ ডান হাত দিয়ে খণ করে চেপে ধরল কুস্তলার বাঁ হাত— “তিষ্ঠ।”

“কেন?”

“কারণ আমি এখন বাড়ি যাব না।”

“এত রাত্রে আবার কোথায়?”

“রাত এমন কিছু হয়নি। মাত্র নটা। তোমার মতো সুন্দরীরা বারটার আগে ফেরে না—বিশেষ করে রোববারে।”

“কী বলতে চাও?”

“তোমার মুখে মদের গন্ধ লেগে রয়েছে, কুস্তলা। ওই জিনিস আমার এখন একটু দরকার। বড় ক্লাজ।”

“ননসেল। বার-দুই যেতে চাও? এ অঞ্চলে নাইট-বার একটাই আছে। তাও উলটোপাশে। আমি যেতে পারব না। হাত ছাড়া।”

“এবার যাবে?”

ড্যাশবোর্ডের আলোয় বস্তুটাকে দেখতে পেল কুস্তলা। রিডলভার। লোকটার বাঁ হাতে।

কুস্তলা অবাক হল না। ভয় পেল না। এই পুরুষটি আকাশ পথে হিলিহিলি করে বেড়ায়। রহস্যজনক ব্যবসায় কিন্তু টাকা কামায়, কিন্তু টাকা ওড়ায়। প্রয়োজনে সুন্দরীদের সঙ্গে রাখে। প্রয়োজনে আরও একটু এগায়। তখন শুধু সুরায় শানায় না। কুস্তলা তার গ্ল্যামার ধার দিয়েছে একে ইতিপূর্বে। তাই কিছু মেয়েলি নিরাপত্তা মজুদ রাখতে হয় হ্যান্ডব্যাগে।

কিন্তু আজ রাত্রে সে পারবে না। কাল অফিস বস থাকবে না। কাজ অনেক।

কঠিন কন্যা কুস্তলার মুখে কোনও কথা আটকায় না। তাই অবলীল্য বলে দিল— “আমার টোটে লেগে থাকা মনটুকুতে যদি তোমার ইচ্ছে চলে যায়, তাহলে তাই হোক। কিন্তু অস্ত্রটা নামাও।”

শুরু সেইখানে। শেষ একদম শেষে। নির্জন পথ। কপনকপে বৃষ্টি। অগত্যা হ্যান্ডব্যাগ খুলতে হয়েছিল কুস্তলাকে—নিরাপত্তার খতিয়ে। খুলতে হয়েছিল গলার স্কার্ফও—পেছনের সিটে লোকটাকে পাশে নিয়ে বসে কুস্তলা বলেছিল— “খুশি তো? এবার বাড়ি যাওয়া যাক।”

“কিন্তু নেশা তো মিলে না।”

“পেগ দরকার? এরপর কী?”

“সূরা আর সাকি যে টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। বিশেষ করে যখন সাকির হ্যান্ডব্যাগে টাকার বাস্তিল থাকে।”

“অফিসের টাকা—”

“চলো!” লোকটার বাঁ হাতে ফের দেখা দিয়েছে নিষ্কষ সেই বস্তুটা।

“না।”

“তাহলে যুমও।”

স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় কুস্তলা দেখতে পেল, বিদ্যুৎ বেগে কালো অস্ত্র আঘাত হানতে যাচ্ছে তার মাথার বাঁ দিকে...

তারপর আর কিছু মনে থাকতে পারে না। দুর্বল হৃদয় আর সচল থাকতে চায়নি। কিছুক্ষণ শুভিয়ে ছিল। তারপর বুকের কল গেল খেমে।

প্রাণহীন দেহটা তুলে স্ট্রিয়ারিং-এর সামনে বসিয়ে দিল পুরুষ। রেনকোট আগেই পরে নিয়েছিল কুস্তলা। খোলা চোখ চেয়ে রইল সামনে।

পেছনের সিটে একটু রক্ত ছিটকেছে। ওটা মোছা দরকার।

রিডলভারেও রক্ত লেগেছে। ওটাও মোছা দরকার। ন্যাকড়া কোথায়?

অত খোঁজবার সময় নেই। নিরাপা রাস্তায় যদি টহলদার পুলিশ এসে যায়...

কুস্তলার গলার স্কার্ফ খুলে নেওয়া হয়েছিল তখনই। রক্ত মোছার জন্যে। হ্যান্ডব্যাগ হাতানো হয়েছিল চার হাজার টাকা আত্মসাৎ করার জন্যে। আর রক্তমাখা স্কার্ফটা তার ভেতরে রাখবার জন্যে। এলোপাতাড়িভাবে পার্কিং স্পেসে গাড়ি ঢুকিয়েছিল কুস্তলা অশান্ত লোকটিকে শাস্ত করার জন্য।

গম্ভীর মুখে সব শুনল জয়স্বর। মনে মনে বলল— “ডায়র, তুমি একটা রামমুখ গল্পবাজ। তবে থিওরিটাকে হাজির করলে বটে অভিনব কায়দায়। এরকম ‘রিসারেকশন’ শার্লক হোমসও পারবে না।”

উর্ধনত্র হয়ে রইল বেশ কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললে—“হ্যান্ডব্যাগটা পাওয়া গেলেই গোল চুকে যেত। গাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড় তো বুজিয়েছিল দেখছি এই স্কোট ম্যাপে—”

“কয়েক স্কয়ার মাইল ধরে তল্লাশি চালিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে নিজে হেঁটেই চম্পট দিয়েছিল খুঁদী। হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে পকেটে রেখেছিল—রক্তমাখা স্বাক্ষর তার মধ্যে ঢুকিয়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় ফেলে গেছে। ও জিনিস নিয়ে কেউ তো বাড়ি ফেরে না। রাস্তা দিয়েও হাঁটে না—লোকের চোখে যাতে না পড়ে, তাই ফাঁকা জায়গায় নিশ্চয় ফেলেছিল। কিন্তু কোথাও পাইনি।”

“এই স্কোট ম্যাপটা দেখছি এয়ারস্ট্রিপের স্কোট। এখানেও খুঁজে পাননি, তাই তো?”

“না।”

“রাত ন’টা নাগাদ কোনও এয়ারক্রাফট ল্যান্ড করেছিল?”

“করেছিল। P68C সিস্টেম-সিটার এয়ারক্রাফট।”

সিখে হয়ে বসল জয়ন্ত—“প্যাসেঞ্জার কারা ছিল?”

ছ-ফুট বড়ির বিলম্ব লম্বা শিরদাঁড়টাকে বেকিয়ে নিয়ে গুঁফো বদন বাড়িয়ে ধরে ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—“সেটাও একটা মিস্ট্রি, স্যার। অন্য লাইনের। প্লেনে পাইলট ছাড়া কেউ ছিল না।”

“সে কী?”

“এ প্লেনে হেরোইন পাচারের কারবার হয়। অথচ লাইসেন্স নেওয়া আছে সিভিল অ্যাভিয়েশনের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে। বড় কোম্পানি তলায় তলায় এই কারবার করে। ‘ব্লুইং আওয়ার’ বাবদ বিশ-বাইশ হাজার টাকা এইভাবে তুলে নেয়। ওটা অন্য লাইনের তদন্ত। লাইসেন্স ক্যানসেল করিয়ে তবে ছেড়েছি। তবে যারা নীচের মহলের ব্যবসা করে, তারা খুঁনে শুওকেও লুকিয়ে নিয়ে আসতে পারে। ইন্ডিয়ায় সব হয়।”

“তা হয়”, থুতনি চুলকে বললে জয়ন্ত।

“আমার থিওরিটা খাড়া করেছিলাম এই কারণেই। কেউ না কেউ সেই রাতে কুশলা শীলকে এনজয় করেছিল—মেয়েটার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ—তারপর টাকার লোভে খুন করে পালিয়েছে। নাইট-বারেও গিয়েছিলাম। মালিক

মারা যাওয়ায় সেই রাতে বার ছিল বন্ধ।”

“ফাইল ক্রোজ করে দিলেন তারপর?”

“আজ্ঞে।”

[৪] মমুরকটী রহস্য

ইন্দ্রনাথ গালে হাত দিয়ে সব শুনে গেল। আমিও শুনলাম। তারপর যা বললাম, তা এই কাহিনীর প্রথম লাইনেই লিখেছি।

তারপরই ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চনমন করে উঠল কাহিনীর শেষ পর্ব শুনে। উপসংহার তো নয়—যেন একটা পরমাণু বোমা।

জয়ন্ত বললে ভয়ঙ্কর পাত্রকে—“এবার ঝেঁড়ে কানুন, মশায়। ফাইল ক্রোজ করেছেন আট বছর আগে। ক্রোজড ফাইল এখন ওপেন করতে চাইছেন। আমাকে তলব করেছেন। কেন?”

“ছিঃ, ছিঃ! ও কথা বলবেন না, স্যার। আপনি মার্ভার এক্সপার্ট—”

“মার্ভার করার এক্সপার্ট?”

“মার্ভার কেস এক্সপার্ট।”

সিরিয়াস হয়ে গেল জয়ন্ত। কেন না, ভয়ঙ্কর পাত্রও সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। হাজার হোক, পোড়খাওয়া পুলিশ অফিসার। ভণিতা যখন করে, তখন তার পেছনেও উদ্দেশ্য থাকে। পুলিশকে যতই সঙ সাজানো হোক, সৎ অফিসারদের প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর লক্ষ্যভেদী অর্জন। অথবা, সাপুড়ে বাহানার বাঁশি বাজিয়ে যায় লক্ষ্য ঠিক রেখে।

ভয়ঙ্কর পাত্র সেই মেট্যালের মানুষ। ধানাইপানাই করে গেছে জয়ন্তকে মেট্যালি তৈরি করার জন্যে। এখন আসছে মিস্ট্রি-পয়েন্টে।

খুঁদে বম্বশেলটা ছাড়া হলো এইভাবে—“স্যার, হ্যান্ডব্যাগ আর স্বাক্ষর দুটোই পাওয়া গেছে।”

হালকা গলায় জয়ন্ত শুধু বলেছিল—“পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখছি নাকি? টুপির মধ্যে থেকে একটার পর একটা বের করেই চলেছেন।”

ভয়ঙ্কর তলাপাত্র নিকুন্তর রইল। নিজের টেবিলের ড্রয়ার টানল। প্রথমে বের করল মমুরকটী ব্যাগ। তারপর, মমুরকটী স্বাক্ষর। দু’হাতে বম্ব দুটো

নিয়ে রাখল জয়ন্তর টেবিলে।

ঘর নিভল।

জীদরেল জয়ন্ত বললে জীদরেল ভয়ঙ্করকে—“নাটকটা ভালই করলেন। ক্রাইয়ার এনে দিলেন।”

“এক-একটা কেস এক-একটা নাটক।”

“তা ঠিক। মেয়েটার নাম হওয়া উচিত ময়ূরকণী। আট বছর আগে এই ব্যাগ আর এই স্বাক্ষর কলক তুলেছিল ময়ূরকণী মেয়ে রোববারের ডিনার পাটিতে। তারপর ময়ূরকণীর ময়ূরী প্রাণপাখি উড়ে গেল—সেই সন্ধ্যা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তার অতি প্রিয় বন্ধু। এই দুটি বন্ধু।”

বন্ধু দুটি না ছুয়ে ঈষৎ বিষর সুরে বলে গেল জয়ন্ত।

তারপর বললে—“তুপির মধ্যে আর কিছু আছে?”

“আছে,” বলে, ড্রয়ার টানল ভয়ঙ্কর। বের করল দ্বিতীয় বিশ্বায়। রাখল জয়ন্তর টেবিলে—“ময়ূরকণী মেয়ের শটহ্যান্ড নোটবুক। এই দেখুন কভার। গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছে নিজের নাম—কুন্ডলা শীল।”

নেটাইন না ছুয়ে শুধু চেয়ে রইল জয়ন্ত। পরিক্ষর হস্তাক্ষর। মাত্র চরিশটা বছরের পরমায়ু নিয়ে এসে তরতর করে উঠে এসেছিল অনেকটা। কর্মজীবনে উন্নতি করতে গলে অনেক দাম দিতে হয়। জয়ন্ত চাকরি করে। জয়ন্ত অনেক পদোন্নতি আদায় করেছে। কিন্তু বিবেককে বিসর্জন দিয়ে দাম সেমনি কক্ষণও।

এই মেয়েটা কি তা দিয়েছিল?

ভারী গলায় বললে—“শটহ্যান্ড লেখা আমি বুঝি না। ট্রানস্লেট করিয়েছেন?”

“করিয়েছি। শেষের শুভো চিঠির ডিকটেশন। বসের বাড়িতে বসে নিয়েছিল—মৃত্যুর আগে। বিজনেস লেটার্স।”

চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে জিনিস তিনটের দিকে চেয়ে রইল জয়ন্ত। হ্যান্ডব্যাগ, স্বাক্ষর আর শটহ্যান্ড নোট বুক। হাত দিয়ে ছুল না।

তারপর চোখ আটকে রইল হ্যান্ডব্যাগে।

“মিস্টার পাত্র।”

“ইয়েস, স্যার।”

“হ্যান্ডব্যাগে আর কী-কী পেয়েছেন?”

“লিপস্টিক, নেল পালিশ, পাউডার, ক্রমাল... আর...”

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। জয়ন্তর চোখ ঘুরে গেল এবার স্বাক্ষরের ওপর। ভাঁজ করে পলিথিন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। স্বচ্ছ আবরণ ফুড়ে যেন ময়ূরকণী জেন্না বেরছে।

“মিস্টার পাত্র।”

“ইয়েস, স্যার।”

“স্বাক্ষর-এর কন্ডিশন দেখে তো মনে হচ্ছে একদম ফ্রেশ। যেন এই মাত্র দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসেছে কুন্ডলা শীল।”

“রাইট, স্যার।”

“পলিথিন প্যাক থেকে বের করে কাইভলি দেখাবেন?”

“সেখুন”, টেবিলের ওপর লম্বা করে স্বাক্ষর বিছিয়ে ধরল ভয়ঙ্কর পাত্র—“সেখাচ্ছেন? রক্তের দাগ এদিকে নেই। এবার দেখুন উলটো দিক। রক্ত মোছার দাগ নেই।”

“তাহলে আপনার থিওরি ভুল। হত্যাকারী খুন করার পর হাতিয়ার মোছেনি স্বাক্ষর দিয়ে।”

“আরও একটা ব্যাপার ক্রিমার হয়ে গেল, স্যার। খুন হওয়ার সময়ে স্বাক্ষর গলায় দেওয়া ছিল না। থাকলে রক্ত লাগত।”

“কারেন্ট?” বলে, আনমনে সতীর্থর সিদ্ধান্ত আপন মনে আউড়ে গেল জয়ন্ত—“কুন্ডলা শীল খুন হচ্ছে। গলায় নেই স্বাক্ষর... গলায় নেই স্বাক্ষর... স্বাক্ষর খুলে রেখেছিল... এমন এক হত্যাকারীর সামনে যার সান্নিধ্যে স্বাক্ষর খুলে রাখা যায়... যখন গলবন্ধীর আবরণ থেকে গলাকে খুলে রাখার দরকার হয়... যখন...”

সামলে নিল জয়ন্ত।

বললে—“টাকা পেয়েছেন?”

“চার হাজারের বাণ্ডিল পাইনি। খুচরো টাকা পয়সা কিছু রয়েছে—কুন্ডলার নিজের।”

একক্ষণে হ্যান্ডব্যাগে হাত দিল জয়ন্ত। খুলল না। উলটে পাটলে দেখল। সেলাইয়ের দাগ বরাবর মাটি লেগে রয়েছে—“পেলেন কোথায়?”

নিজের চেয়ারের গিয়ে বসল ভয়ঙ্কর পাত্র—“খুন যেখানে হয়েছে কুন্ডলা শীল, সে জায়গার ধারে কাছে নয়।”

“তাহলে কোথায়?”

“বস-এর বাড়িতে।”

হ্যান্ডব্যাগের ওপর চোখ রেখেই কথা বলে যাচ্ছিল জয়ন্ত। ময়ূরকণী জেন্না যেন তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। শেষ কথাটা কানের মধ্যে দিয়ে এনে ঢুকে গেল গরম লোহার শিকের মতো।

“বস-এর বাড়িতে?”

“বাড়িটার নাম ‘মরকত ভবন’। ‘গ্রিনটাউন’-এর বাইরে ছিল আট বছর আগে—এখন নেই। শহর ছড়িয়ে পড়ছে।”

জয়ন্ত বোবা। ভয়ঙ্কর পাত্র ভদ্রলোক সতিাই ভয়ঙ্কর নাটক সাজিয়েছে। এ লোক পুলিশ মহলে নাম করবে।

ভয়ঙ্করের পরবর্তী বর্ণনামূলক এই ভাবে:

“সেই বাড়ি এখন নার্সিংহোম হয়ে গেছে।”

জয়ন্ত চেয়ে রয়েছে।

ভয়ঙ্কর বলে থাকছে—“বাড়ির মধ্যে ফাঁকা জমি যেখানে ছিল, সেখানে বাড়ি তৈরির তোড়জোড় চলছে। সব জমিতে যদিও এখনও হাত দেওয়া হয়নি। তিন দিন আগে বাগানের মালী পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা থেকে খান কয়েক চ্যাটাল পাথর খুঁড়ে তুলে নিচ্ছিল। ফুলগাছের লাইন ওইখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।”

বলে, খামল ভয়ঙ্কর পাত্র।

“তারপর?” আর চুপ করে থাকতে পারল না জয়ন্ত। সাসপেন্স তৈরি করতে পারে বটে ভয়ঙ্কর।

জবাবটা এল এই ভাবে—“পাথরের তলায় পেল হ্যান্ডব্যাগ আর স্বাক্ষর।”

[এ] টনক নড়ল ইন্সপেক্টর

ভয়ঙ্করের ঘাত প্রতিঘাত ইন্সপেক্টর এমনই নিবিষ্ট করে রেখেছিল যে নসি়া নিতেও ভুলে গেছিল। লক্ষ করছিলাম, চাহনি কিন্তু তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মাথায় রক্ত চড়ছে।

জয়ন্ত নীরব হতেই বের করল নসি়ার ডিবে। শুধু ধরে রইল। ডিবের দিকে চেয়ে রইল। তারপর চোখ তুলে বললে—“কেস ইন্টারেস্টিং।”

তারপর নিল নসি়া। সম্বন্ধে।

জয়ন্ত ব্রিককেস খুলে একটা গোবদা ফাইল নিয়ে রাখল কোলের ওপর। ইন্সপেক্টর সে দিকে চেয়েও দেখল না।

জয়ন্ত গলা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললে—“ওহে টিকটিকি, মানে কী, বোঝা গেল?”

“অভিশয় স্পষ্ট,” বসন্ত টোঁধুরি ঢঙে বললে ইন্সপেক্টর প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণে অদ্ভুত কারুকাঙ্ক্ষ দেখিয়ে—“কুন্ডলা শীল সেই রবিবারের রাতে ‘মরকত ভবন’ থেকে বখান বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তার গলায় ছিল না ময়ূরকণী স্বাক্ষর, হাতে ছিল না ময়ূরকণী ব্যাগ।”

“ব্যাগটা হাতে ছিল না, কাঁধে বুলছিল”, ব্যাখ্যা করে দিল জয়ন্ত—“ভয়ঙ্কর ভূতটাকে এই পর্যায়ে প্রব্রঞ্জন করেছিল। ব্যাগ হাতে ছিল, না, কাঁধে ছিল? কাঁধে ছিল—দেখেছে তিনজন।”

“সেই তিনজন?” বলেই চুপ করে গেল ইন্সপেক্টর।

“হ্যাঁ, সেই তিনজন—শুধু তিনজন—যারা দাঁড়িয়ে থেকে বিদায় নিতে দেখেছে কুন্ডলা শীলকে।”

“বেশ, বেশ। শুধু তিনজন।”

“ভয়ঙ্কর ভূতকে কাগাঁসা করবার চেষ্টা করলাম আরও একটা প্রব্রঞ্জন দিয়ে। কুন্ডলা শীল স্বাক্ষর গলায় জড়িয়েছিল কিভাবে, প্রত্যেককে আলাদা ভাবে তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি? ভয়ঙ্কর বললে—ইয়েস, স্যার। তিনজনকে সেপারেটলি জিজ্ঞেস করেছিল—তিনজনেই হুবহু একই বর্ণনা দিয়েছে, কিভাবে স্বাক্ষর জড়িয়েছিল কুন্ডলা শীল।”

“ব্যাগ হাতে ছিল, না, কাঁধে ছিল—এটাও কি সেপারেটলি জিজ্ঞেস করেছিল?”

“করেছিল। তিনজনেরই স্টেটমেন্ট এক। ব্যাগ বুলছিল কাঁধে, স্বাক্ষর বাঁধা ছিল বিশেষ কায়দায়। কায়দাটা কীরকম, তাও সেপারেটলি দেখিয়েছে তিনজন।”

“তিনজন?” অস্পষ্ট গলায় বললে ইন্সপেক্টর।

“হ্যাঁ, তিনজন, প্রতিধ্বনি করে গেল জয়ন্ত।”

“মিথ্যা বোলেছিল এই তিনজন।”

“স্টেটমেন্ট লেখা হয়েছে এই মিথ্যের ওপর।”

“দাঁও সেই স্টেটমেন্ট,” এতক্ষণে হাত বাড়ল ইন্সপেক্টর। জয়ন্ত যখন ফাইল হাতড়াচ্ছে, আমার দিকে তাকিয়ে বললে—“মুগ্ধ, এই জনোই

বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ক্রোজড ফাইল এখন ওপেন হচ্ছে।”

বোবার শব্দ নেই, তাই চুপ করে রইলাম।

একগোছা স্টেটমেন্ট বাড়িয়ে ধরল জয়ন্ত-“ছ’জনের স্টেটমেন্ট দিলাম। অঞ্জনা আর কুন্ডলা ছাড়া যে চার জন ছিল ডিনার পার্টিতে, সেই চার জনের প্রাঙ্গণ বাবা আর মায়ের।”

প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ দেখল ইন্দ্রনাথ। আট বছর আগে দেওয়া স্টেটমেন্ট। এই জবানির ভিত্তিতেই কুন্ডলা শীলের হত্যাকারীকে ধরা যায়নি। কেস ধামাচাপা পড়েছে। খনী বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি রোমাঞ্চ কাহিনী লিখি। নিজেকে রোমাঞ্চিত হই না। কিন্তু সেদিন হয়েছিলাম। ঘর যখন নিস্তব্ধ, জয়ন্ত যখন একদৃষ্টে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি তখন কাঠ হয়ে রয়েছি।

ভাবছি, হত্যাকারী কে?

[৩] হত্যাকারীর সন্ধান

নৈশক্য ভঙ্গ হল।

বললে ইন্দ্রনাথ-“মিস্টার তথাগত ঘোষদত্তিদার। কুন্ডলা শীলের বস। থাকতেন ‘মরকত ভবন’-এ।”

“হ্যাঁ”, জয়ন্তর জবাব।

“এখন থাকেন না। সে বাড়িতে এখন নার্সিং হোম হয়ে গেছে?”

“হ্যাঁ।”

“কবে?”

“সাত বছর আগে।”

“কেস ক্রোজড হওয়ার এক বছর পরে?”

“হ্যাঁ।”

“উনি গেলেন কোথায়?”

“একটা ছোট বাড়িতে।”

“মরকত ভবন’-এ প্রায় একটা প্রাসাদ-তোমার মুখেই শুনলাম একটু আগে।”

“ঠিক তাই।”

“প্রাসাদে থাকতে গেলে রাজার মতোই থাকতে হয়। তথাগত ঘোষদত্তিদার সেই ভাবেই ছিলেন নিশ্চয়?”

“ভয়ঙ্কর পাত্র সেই রকমই দেখেছিল।”

“প্রাসাদ ছেড়ে পূর্ণকুটির কেন গেলেন? রাজকীয় লাইফ-স্টাইল তাগ করে সাদামাটা লাইফ-স্টাইল কেন বেছে নিলেন? স্বচ্ছন্দ্য, না, চাপে পড়ে?”

“আমার বিশ্বাস, চাপে পড়ে।”

“অর্থকষ্ট মেটাতো?”

“অবশ্যই।”

“তথাগত ঘোষদত্তিদারের বিজনেস কি টাল খেয়েছিল?”

“না। এখনও রমরমিয়ে চলছে। কিন্তু উনি আর বিজনেসে নেই।”

ভুরু তুলল ইন্দ্রনাথ-“কেন?”

“সেইটা জানবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে যাব। ইনটারোগেশনের দেনলা বন্দুক চালাতে হবে।”

“আমি যাব। তার আগে জানতে চাই, বিজনেস যখন রমরমিয়ে চলছে, তখন দেখছে কে?”

“জুনিয়র এক্সিকিউটিভ সুরেশ দে।”

স্টেটমেন্টের গোছার দিকে চোখ নামালো ইন্দ্রনাথ-“সুরেশ দে।

নিথো স্টেটমেন্ট যারা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জিতীয়া।”

“তথাগত ঘোষদত্তিদারের প্রাণের বন্ধুও বটে।”

“তাই জুনিয়র এক্সিকিউটিভকে বিজনেস দেখতে দিয়েছেন পুরোপুরি।”

“ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ বানিয়ে দেওয়ার পর।”

চোখ ছোট হল ইন্দ্রনাথের-“প্রমোশন দিলেন, বিজনেস ছেড়ে দিলেন, প্রাসাদ ছেড়ে ছোট বাড়িতে চলে এলেন। স্ট্রেক্স, নয় কি, জয়ন্ত?”

“নইলে তোমাকে জ্বালাতে আসি? আর একটা ইনফরমেশন বের করেছি ভয়ঙ্করের পেট থেকে। শুনলে খ হবে।”

“যথার্থ?”

“সুরেশ দে বিয়ে করেছে চম্পা সাহাকে।”

[৭] প্রেমের চতুর্ভুজ

সত্যিই খ হয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

বুজির গগনে যে নাকি নক্ষত্র হয়ে গেছে, আমেরিকার এফ-বি-আই গোয়েন্দাসংস্থা ইন্ডিয়াস সাইবার ক্রাইম সলভ করার জন্যে যার খারস্ব হচ্ছে,



ইনফোটেক ল’র গলিঝুঁজি দিয়ে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে ভারত সরকার যার বুদ্ধি নিচ্ছে, সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র খ হয়ে গেল জয়ন্তর গ্রেনেড ইনফরমেশনের বিফোরসে।

তারপর খুব আন্তে বললে-“জয়ন্ত, আট বছর আগে ডিনার পার্টির গেষ্টদের ডিটেলস বলবি?”

ইন্দ্রনাথ, আমি, জয়ন্ত-তিনজনেই স্ক্রিপ্টচার্ট কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। তুই-ভোকারির সম্পর্ক ছাড়িয়ে ইদানীং ‘তুমি’ সংসোধনে চলে এলেন পুরনো দিনের মতো জম্পেশ আড্ডা যখন শুরু হয়, তখন অজান্তেই মুখ দিয়ে তুই-ভোকারি বেরিয়ে আসে। এই নিয়ে আমার গিমি কবিতা কম বোঁচা মারেনি। সেদিনের আসরে হাজির থাকলে তিনজনকেই বুঢ়িয়ে মারত।

ভাগ্যিস ছিল না। বড় বাগড়া দেয় টান-টান কাহিনীর মধ্যে। বিশেষ করে ইন্দ্রনাথের ভীমের প্রতিজ্ঞার জন্যে বেচারার প্রাণ ওঠাগত করে ছাড়ে। মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় ইন্দ্রনাথ। থাকুক না। ওর সঙ্গে প্রেম করেছে তো বিপদ। পাকাল মাছের মতো পিছলে যাবেই। ‘মোমের হাত’ কেসে প্রেমের অভিনয় করেছিল-কাম ফতে হয়ে যাওয়ার পর কেটে পড়েছিল। ‘শার্লক হোমস ক্লাব’ কেসে আইডরি লাহা ইন্দ্রনাথকে ধরেও ধরতে পারেনি। বেশি চাপতে গেলে বিপদ আছে। তখন জীবন্ত ব্রেক হয়ে দু’দিকে কেটে বেরিয়ে যাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ‘প্রিন্সেস’ বলে খেপাত যে মেয়েটিকে, বিভালাক্ষি স্বর্ণকেশী অপরূপা সেই সহপাঠিনীর পূর্বপুরুষরা সত্যিই ছিল রাজবংশের মানুষ। ইন্দ্রনাথ তখন তো নমস্যা ব্যক্তি হয়নি-থাকত সাধারণ একটা মেসে। প্রিন্সেস-এর বাড়ির লোকেরা মেয়েটাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয় এক রাজপুরুষের সঙ্গে। সেই থেকে ইন্দ্রনাথ ভীম বনে গেছে। সেই রাজবাড়ির কোনও কেস নেয় না। এমনকি, বালিগঞ্জে মহারাজার প্যালেসের সামনে দিয়েও কখনও যায় না। কিন্তু পাশের একটা চৌদ্দতলার মস্ত ফ্ল্যাট কিনে ফাঁকা ফেলে রেখে দিয়েছে-যে ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বহু নিচে দেখা যায় রাজবাড়ির মস্ত গম্বুজ।

এত কথা আমি ছাড়া কেউ জানে না। কখনও লিখিনি। পুরনো ঘরে খোঁচা মারতে চাইনি, বেলেঘাটার বাড়ি তো আমার বউ জোর করে ওকে দিয়ে কিনিয়ে ওকে ওখানে বসিয়েছে। অনেক দূরে জলের ধারে থাকতে চায় থাকুক। কিন্তু ওর অন্তরের অন্তঃস্থলের সেই অতীত বেদনা মাঝে মাঝে আচমকা উলটলিয়ে দেয় ওর হৃদয়াকলকে, যখনই প্রেমঘটিত ব্যাপারে জটিল কুটিল সর্পিলাবদ্ধ রূপ দেখতে পায়।

সুরেশ দে চম্পা সাহাকে বিয়ে করেছে শুনে তাই নিবাত নিম্পশ্চ নিরেট নিটোল ইন্দ্রনাথ রুদ্রও আর বুদ্ধদেবের মতন প্রশান্ত লাচনে থাকতে পারল না। দুই চোখের পাতা অকস্মাৎ পুরো খুলে গেল। পূর্ণ চাহনি স্থির হয়ে রইল পাথর-চোখে।

সুরেশ দে বিয়ে করেছে চম্পা সাহাকে। করতে পারে। করেছে। একজন পুরুষ বিয়ে যদি করে একজন নারীকে, তাহলে এত উত্তলা এবং একই সঙ্গে এত অতলা হওয়ার কী আছে?



অতএব, হতবাক হলাম আমিও।

ইন্দ্রনাথের দ্বির-লোচন কিন্তু বাধ্য হয়ে উঠল পরক্ষণেই। শব্দের নির্বিরণী ঝরাল কণ্ঠ দিয়ে।

“জয়ন্ত, হুজুরের ডিনার পার্টিতে তথাগত ঘোষদন্ডিদার, মানে, বস-আর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি, মানে, কুন্ডলা শীল-ছাড়া আর যে চারজন হাজির ছিল, তারা ছিল জোড়ায় জোড়ায়। তাই তো?”

“একজন নিয়ে গেছিল তার বাগদত্তাকে, আর একজন নিয়ে গেছিল তার গার্ল ফ্রেন্ডকে। দুই প্লাস দুই-চার।”

“প্রেমের চতুর্ভুজ রচনা করেছিল পার্টিতে যাওয়ার আগে থেকেই। রিপোর্ট তো এই মাত্র পড়লাম। তাতে দেখছি সুরেশ দে’র গার্ল ফ্রেন্ড ছিল অঞ্জনা মল্লিক। চক্কল সেনের বাগদত্তা ছিল চম্পা সাহা।”

“এটা একটা ঘটনা।”

“হ্যাঁজু ইওর ঘটনা। ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে এ ঘটনা ঘটল কেন? চক্কল সেনের বাগদত্তাকে সুরেশ দে বিয়ে করে বসল কেন?”

“হে বন্ধু, তুই বড় উত্তেজিত হচ্ছিস-”

“হবার কারণ আছে বলেই হচ্ছে। একটা মেয়েকে বিয়ে করব বলে নাচিয়ে তাকে বিয়ে না করাটা একটা সোশ্যাল ক্রাইম।”

“মানছি। কিন্তু ক্রীম্যাক্সরিম-”

“ফট ফট করিসনি। এ বিয়েটা কি হৃদয় বিনিময়ের ফলে হয়েছিল?”

“মানে?”

“কোন তিনজন দেখেছিল কুন্ডলা শীলকে গলায় স্ফাক জড়িয়ে আর কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে যেতে?”

[৮] সেই তিনজন

“সুরেশ দে, চক্কল সেন আর চম্পা সাহা।” জয়ন্তের জবাব।

“সুরেশ দে গেছিল কোন মেয়েটার আঁচল ধরে?”

“অঞ্জনা মল্লিকের আঁচল অথবা ওড়না ধরে।”

“চক্কল সেন গেছিল কার লগে লগে?”

“চম্পা সাহা তার নাম।”

“গ্লোরিয়াস! চতুর্ভুজের চারকোণে চার মর্তিমান। সুরেশ-অঞ্জনা, চক্কল-চম্পা। রিভিয়ার্স্ট। ওহে মুগাঙ্ক, বিয়ের কত বিপদ দেখেছ? লাভ-প্রান ছিল কী? সুরেশ চেয়েছিল অঞ্জনাকে, চক্কল চেয়েছিল চম্পাকে। কুন্ডলাকে কে চেয়েছিল, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু কুন্ডলা নিজে খতম হয়ে গিয়ে লাভ-প্রান দিল ভেঙ্গে। লাভ-প্রান হয়ে গেল ব্ল্যাকমেল-প্রান।”

“আই সি। আই সি।”

“সি করেছ অনেক আগেই, মাই ডিয়ার পুলিশ বন্ধু। তোমরা ডুবে ডুবে জল খাও। বুলডোজার চালানোর জন্যে দরকার এই পয়মালকে, আই মিন, প্রীটিন প্রীক্টিফিকারেশী ইন্দ্রনাথ রক্ষকে তলব করো।”

“ইন্দ্র, তুই মুড়ে এসে গেছিস।”

“হ্যাঁ, এসে গেছি। কারণ সেই ইটারন্যাল গেম-প্রান এখানেও দেখতে হচ্ছে। প্রোটোনিক লাভ-এর যুগ জাহারমে গেছে-এখন শুধু অন্ধ কবো, আর গাঁট ছড়া বাঁধো। দূর। দূর।”

আমি প্রতিবাদের ঝড় তুললাম-“কবিতা নেই বলে যা-তা বলে যাচ্ছিস। আমাদের বিয়েটা ফাইভ হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রোটোনিক লাভ-”

“ছিল, এখন নেই”, বলেই দুম করে কথা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ-“অঞ্জনা, অঞ্জনা, শুধু এই অঞ্জনা মেয়েটাই এই ব্ল্যাকমেল-প্রানের মধ্যে নেই। তাকে রাখা হয়নি। কারণ, সে দেখেনি কুন্ডলা শীলকে বিদায় নিয়ে ‘মরকত ভবন’ থেকে বেরিয়ে যেতে।”

“তা বটে-”

“তাই সুরেশ দে অবলীলাক্রমে ‘ডিভ’ করল অঞ্জনা মল্লিককে। গার্লফ্রেন্ড বই তো নয়-ইউডে ফেলে দিলেই হল। সুরেশের দরকার ছিল ব্ল্যাকমেলিংয়ের জন্যে দল ভাঙ্গা করা। তাই টান দিল চম্পা সাহাকে। চম্পা সাহা ‘ডিভ’ করল চক্কল সেনকে। মালা দিল সুরেশ দে’র গলায়-”

“তুফান মেল চালাচ্ছিস, ইন্দ্র। একটু দম নে। আমাকে বলতে দে,” জয়ন্ত এখন একটা সিক্রেট সেল-এর চিফ-ওফে আর রোখা গেল না-“চক্কল সেনও তো দেখেছিল কুন্ডলা শীলকে পায়ে পায়ে বিদায় নিতে। চম্পা সাহা’র সঙ্গে ব্ল্যাকমেলিং জুটি বাঁধলেই তো পারত? তার পক্ষে এই জোট সহজতর ছিল-চম্পা তো তার বাগদত্তা-লিগ্যাল মমুমলিনের জন্যে প্রস্তুত করেই রেখেছিল নিজেকে-”

“ওরে জয়ন্ত দ্য সিক্রেট চিফ, তথাগত ঘোষদন্ডিদারের চালু বিজনেসে কোন ব্ল্যাকমেলারের ওয়েট বেশি?”

“ইয়ে-সুরেশ দে’র, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ সুরেশ দে’র-”

“যে জানে ব্যবসার ন্যাউনক্লর, জানে বস-য়ের কোথায় কোথায় কনটাক্ট-কুৎসার মতো মহামারী অস্ত্র প্রয়োগের খেলা জানা সুবিধে তো তারই হাতে-চক্কল সেনের হাতে নয়-সে তো অন্য কোম্পানির জুনিয়র এক্সিকিউটিভ। অ্যাম আই ক্লিয়ার, মাই ফ্রেন্ড?”

“চম্পা সাহা একটা যুথু মেয়ে, এই তো? চক্কল সেনকে গের্গে রেখেছিল ফিউচার সিকিউরিটি আর প্রসপারিটির জন্যে। বেই দেখলে, সুরেশ দে’কে বঁধুশিতে গের্গে রাখলে লাভ বেশি-কারণ সুরেশ বেশি দোহন করতে পারবে তথাগত ঘোষদন্ডিদারকে, অমনি বাগদত্তা হওয়ার বাক্য ছাইয়ের গাদায় ইউডে ফেলে দিয়ে ভিড়ে গেল সুরেশ দে’র সঙ্গে। ন্যাস্টি গেম।”

“মেয়েদের কাছে এসব ব্যাপার ন্যাস্টি নয় মোটেই জয়ন্ত-এই জানোই আমার আইবুড়া মন্দিরের একমাত্র সদস্য অথবা সেবায়ত তুই। যাক বড় বাজে কথা হচ্ছে। বড় উত্তেজিত হয়ে গেছি। মুগাঙ্ক, মুখখানা অমন প্যাচার মতো কথা রাখিসনি-কবিতা বউদি একটা এক্সপারশন। বাঃ, এই তো মুখে হাসি ফুটেছে। জয়ন্ত, সুরেশ দে লোহন চালিয়ে পেয়েছে প্রমোশন প্লাস পুরো ডিউজনেসের বকলমে মালিকানা-আর একজন ব্ল্যাকমেলারকে জীবন সঙ্গিনী বানিয়ে নিয়ে-আসলে কিসের সঙ্গিনী তা মুখে আটকাচ্ছে বলে বললাম না-কিন্তু থার্ড ব্ল্যাকমেলার, আই মিন, চক্কল সেন দ্য এক্সিকিউটিভ অফ অন্য কোম্পানি-দোহন-দৌলত হিসেবে কী পেয়েছে?”

“সে আর জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেই। নিজেই একটা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম খুলে বসেছে বোম্বাইতে-”

“কুন্ডলা শীল-এর পরলোক প্রশ্নানের নিশ্চয় এক বছর পরে?”

“এগজ্যাক্টিলি”

“বিয়ে করেছ?”

“হ্যাঁ।”

“কাকে?”

“অঞ্জনা মল্লিককে নয়। সুরেশ দে’র উচ্ছিষ্টকে নয়।”

“ল্যাংগুয়েজ, ল্যাংগুয়েজ, পুলিশের মুখ মাঝে মাঝে বড় নোংরা হয়ে যায়। তাহলে, সাম অ্যান্ড সাবসট্যান্স দাঁড়াচ্ছে এই: সুরেশ-চক্কল-চম্পা...এই তিনজনের অবস্থা ফিরে গেছে কুন্ডলা খুন হওয়ার এক বছর পরে?”

“হ্যাঁ।”

“তথাগত ঘোষদন্ডিদারের অবস্থা পড়ে গেছে কুন্ডলা খুন হওয়ার এক বছর পরে?”

“হ্যাঁ।”

“তথাগত ভ্রমলোক কি বিবাহিত ছিলেন, অথবা, এখন বিয়ে করেছেন?”

“না।”

[৯] জেরার বুলডোজার

নসি় নিল ইন্দ্রনাথ। ব্রেনকে একটা বাকুনি দিল। উচ্চতর চিন্তা শক্তিকে জেরাদার করে নিল ব্রেনের পাতলা গ্রে মাটির স্তরে।

বললে-“পার্টি-ফার্মিটেডে যাওয়ার সময়ে একটা অলিখিত সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। জুটি বেঁধে যেতে হয়, কপোত-কপোতীর মতো মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হয়। নইলে বেমানান ঠেকে। বিশেষ করে ছোট পার্টিতে। আট বছর আগে হুজুরের ছোট পার্টিতে এই শোভনভা দেখিয়েছিল সুরেশ আর চক্কল। পার্টি-বিহারের জন্যে লালায়িত হয়েছিল অঞ্জনা আর চম্পা। তথাগত ঘোষদন্ডিদার কি কুন্ডলা শীলকে পার্টি-সঙ্গিনী ধরে নিয়েছিলেন?”

“খবর নিয়ে জেনেছি, তথাগত ঘোষদন্ডিদার ছিলেন কুন্ডলার ডাবল বয়সী। আটক্লিশ।”

“তাতে কিসস এসে যায় না। অকৃতদার তো ছিলেন। যার সাথে যার মজ্ঞে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। তথাগত কি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কুন্ডলাকে? প্রজাপতির মতোই আটক্লিশ ছিল বলেই তো কুন্ডলাকে করা হয়েছিল পার্সোনাল সেক্রেটারি। ডিনারে ডাক দেওয়া কি একটা সিগন্যাল নয়?”

“বাপের বয়সী-”

“ডাশ ইট।”

“হ্যাঁ, এরকম সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

“ওই তিনজন কি এই রসের সম্পর্ক জানত?”

“তিনজনেই পরস্পর ব্ল্যাক তা অস্বীকার করেছে।”

“অর্থাৎ, তথাগতকে আড়াল করে গেছে। রাজার হালে থাকব। অথচ প্রথম রিপুকে দমন করে রাখব-তা কি হয়? হয়, সব ক্ষেত্রে নয়। পনের আনা

ক্ষেত্রে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হয়। কন্যারাই খাওয়ায়—মুনিষবিরা পার পায়নি—তথাগত ছাড়া। আশুন আর যি পাশে রাখলেই—

“ইস্রনাথ, তুই কি উঠবি? সেবি হয়ে যাচ্ছে...”

“হ্যাঁ, চল। জেরার বুলডোজার না চালালেই নয়।”

“কিন্তু অঞ্জনা মেয়েটা যে খঞ্জনার মতই উড়ে গেছে।”

“সেই লাভ—লেডি থাকে ‘ডিভ’ করেছিল সুরেশ দে? নিরুদ্দেশ?”

“হ্যাঁ।”

ভাবিত হল ইস্রনাথ—“মূল সিক্রেট সন্ধে নিয়েই উড়ে গেল কি?”

“মার্জার সিক্রেট?”

“কুন্ডলা যখন ‘মরকত ভবন’ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মরতে চলেছে, তখন অঞ্জনা কোথায় ছিল?”

একটু চুপ করে থেকে জয়ন্ত বললে—“এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে একজনই—সুরেশ দে, যে ‘ডিভ’ করেছিল অঞ্জনাকে।”

“কেন করেছিল, সেটাও সুরেশের পেট থেকে নিড়ে বের করতে হবে। একটা জিনিস ভুইও বুঝেছি, আমিও বুঝে ফেলেছি। এভিডেন্স একদম নেই—শ্রেফ কনফেশনের ওপর কেস খাড়া করতে হবে।”

“টায় জব,” শব্দ মুখে বললে জয়ন্ত।

“মহাজেট ভাঙতে হবে, ব্ল্যাকমেলাসনের মহাজেট।”

“সেইসঙ্গে মার্জারের স্টিল নার্ভ গুঁড়িয়ে দিতে হবে।” “ইন্টারেস্টিং।” বলে, তৃতীয়বার নস্য গ্রহণ সমাপ্ত করল ইস্রনাথ।

[১০] মহাজেট

ডটকম-এর যুগে ইন্ডিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীটা টেনিস বলের মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে—ইন্ডিয়াও তাই। আকাশ পথে ক্যালকাটা থেকে ‘গ্রিন টাউন’ পৌছলাম এই জাতীয় ব্যয়বহুল অগ্রগতির জন্যে। আমি ছিনেজোকের মতো পিছনে লেগেছিলাম। এই কেসকে একটা কানাগলি কেস বলা যায়। ব্লাইন্ড লেন কেস। চুটয়ে তদন্ত হয়েছে। দেওয়ালের সামনে তদন্ত শেষ হয়েছে—দীর্ঘ আট বছর আগে। প্রোতলোকে বসে নিশ্চয় অস্থির হয়ে রয়েছে কুন্ডলা শীলা। তাই প্রোতলোকে মালীকে প্রভাবিত করে বাগানের এমন পাথর তুলিয়েছে, যার নীচে গচ্ছিত রয়েছে তার অতি প্রিয় নুট বস্তু—স্বাক্ষর আর ব্যাগ।

এরকম ব্যাপার ফ্যানটাসি গল্প উপন্যাসে মানায়। বাস্তবে যখন ঘটে, তখন আমার মতো গল্পকার উদ্ভট কল্পনার বৃন্দ হয়ে থাকতে ভালবাসে।

কিন্তু ইস্রনাথ আর জয়ন্ত তো অন্য পদার্থ দিয়ে গড়া, আকাশ পথে যেতে যেতে অদ্ভুত আবিষ্কার আর রহস্যাবৃত পঙ্করথীকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি শুনে গেছি। অঞ্জনা, চম্পা, সুরেশ, চঞ্চল, তথাগত—এই পাঁচজনের ‘লাইফ হেল’ করে ছাড়তে হবে। মহাজেট ভাঙতে হবে। তবে বসি পাপিষ্ঠ হত্যাকারীকে হাতকড়ি পরানো যায়, সত্য গোপনের চার্জে পঙ্করথীকেই ফাঁসানো যায়। ওদের ‘লাইন অফ অ্যাকশন’ আগে থেকেই বলতে চাই না।

“গ্রিনটাইল্ড”—এর পুলিশ হোমে আমরা শুজিয়ে বসতে না বসতেই ভয়ঙ্কর পাত্র এল হৃদয়ঙ্গম। সত্যিই একটা নিকষ দৈত্য। এবং, বিকট।

বললে খেত দত্তের শোভা প্রদর্শন করার পর—“স্যার,” বলছে জয়ন্তকে—“স্যার, আপনার ইলেক্ট্রাকশন ক্যারি-আউট করতে পারলাম না।”

“কোন ইলেক্ট্রাকশনটা?” জয়ন্ত তখন সিক্রেট চিফ-এর পোজ নিয়ে ফেলেছে।

“অঞ্জনা মল্লিক—এর বর্তমান ঠিকানা পেলাম না।”

“আট বছর আগেও তো পাননি—রিপোর্টে দেখিনি।”

“তখন তেমনভাবে খুঁজিনি।”

“মানে?”

“তারজনেই যখন একই স্টেটমেন্ট দিলেন। তখন আর অঞ্জনা মল্লিককে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি।”

“আপনি হ্যাঁ স্টেটমেন্ট আমাকে পড়িয়েছেন। কুন্ডলার বাবার, কুন্ডলার মায়ের, সুরেশের, চঞ্চলের, চম্পার আর তথাগতের।”

“আজ্ঞে।”

“অঞ্জনার স্টেটমেন্ট নেননি?”

“তাকে আর পাওয়া যায় নি।”

“একটু আগে বললেন, অঞ্জনা মল্লিককে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি।”

“বলেছি।”

“খুব একটা” শব্দ দুটোর ওপর একটু জোর দিলেন।”

“দিয়েছি।”

“কেন দিলেন?”

“মেয়েটা কলগার্ল ছিল বলে।”

“কলগার্ল।”

“ইয়েস, স্যার। ‘গ্রিনটাইল্ড’ ইন্সট্রিয়াল টাইল্ড। এখানে ওই জিনিসের আকৃষ্ণার দরকার হয়। একটা কলগার্ল হোম-ও আছে।”

“অঞ্জনা যে কলগার্ল, তা জানলেন কী করে?”

“সুরেশ দে বলেছেন। ওঁর কাছেই ঠিকানা চেয়েছিলাম। পার্টতে যাওয়ার জন্যে ‘বুক’ করেছিলেন অঞ্জনাকে।

“আই সি... আপনি গেছিলেন কলগার্ল হোমে?... ”

“পাইনি অঞ্জনাকে। পাখি উড়ে গেছিল। বাইরের বোর্ডে লেখা আছে ‘লেডিজ হোস্টেল’। আসলে... যাকগে। বোর্ডাররা মাঝে মাঝে উড়ে যায়।”

“কোথায় যায় তা নিশ্চয় রেজিস্টারে লিখে যায়?”

“লেখা আছে—ক্যালকাটা। আর কিছু না।”

শুম হয়ে রইল জয়ন্ত। ভয়ঙ্কর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আড়চোখে দেখছে ইস্রনাথকে। ওর যা চেহারা, দেখেই মালুম হয় বস্তু কী। আমি একটা নেহাতই ছাপোষা বাঙালি। আমাকে একবারের বেশি দু’বার দেখার দরকার হয় না।

দুম করে বললে ভয়ঙ্কর—“স্যার, ইনিই তো ইস্রনাথ রুদ্র?”

জয়ন্ত মুখ খোলার আগেই হেসে বললে ইস্রনাথ—“হ্যাঁ, আমিই সেই অধম। আর ইনি আমাকে দেখিয়ে—‘প্রখ্যাত লেখক মুগাঙ্ক রায়।—আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। কুন্ডলার কেস আপনি ব্রেকথ্রু করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আট বছর আগে লেখা কেস রিপোর্ট ছবির মতো স্পষ্ট। দেখে শোখা উচিত আজকালকার অফিসারদের। অঞ্জনার স্টেটমেন্ট নেননি, তাকে পাননি বলে। তথাগত কি বলেছেন রিপোর্টে?”

“পড়বেন?” ব্রিফকেস খুলতে গেল ভয়ঙ্কর।

“মুখে বলুন। টাইম ইজ শর্ট, লাইফ ইজ শর্ট।”

“সার কথায়, কুন্ডলা যখন বিদায় নিচ্ছে, উনি তখন প্রাইভেট চেম্বারে ছিলেন।”

“প্রাইভেট চেম্বারে? অফিস রুম নিশ্চয়?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। চিঠির ডিকটেশন দিয়েছিলেন ওই ঘরে বসেই। অঞ্জনা তখন ওই ঘরেই ছিল।”

“কুন্ডলা চলে যাওয়ার পরেও ছিল?”

“হ্যাঁ।”

“আই সি। তাই কুন্ডলাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে শুধু তিনজন—সুরেশ, চঞ্চল আর চম্পা। তাই তিনজনের স্টেটমেন্ট আলাদা ভাবে নিয়ে ভেরিফাই করে আপনি দেখেছেন, একই কথা তিনজনেই বলেছে।”

“ইয়েস, স্যার।”

ইস্রনাথ খুব আন্তে বললে—“অঞ্জনা তখনও প্রাইভেট চেম্বারেই বসে রইল?”

“তিনজনে তাই বলেছে... তথাগতও...”

“সত্যে। আপনি অঞ্জনার ঠিকানা জোগাড় করলেন পরের দিন? সুরেশের কাছ থেকে?”

“হ্যাঁ। তখন রাত নেমেছে—”

“অঞ্জনাকে খুঁজতে গেলেন কখন?”

“তার পরের দিন সকালে। গিয়ে শুনলাম, তার আগের দিন রাতে, মানে, আমি যখন ‘মরকত ভবন’-এ রয়েছি, তখন অঞ্জনা মল্লিক ‘লেডিজ হোস্টেল’ ছেড়ে গিয়ে চলে গেছে।”

চোখের পাতা পড়ল না ইস্রনাথের—“যখন তদন্ত করছিলেন, ঠিক তখন? কটা পর্যন্ত ছিলেন ‘মরকত ভবন’-এ?”

“রাত প্রায় নটা পর্যন্ত।”

“অঞ্জনা চলে গেল কটা? রেজিস্টারে সময় লিখে গেছিল নিশ্চয়। দেখেছেন?... ”

“দেখেছি, রাত দশটায়।”

“খটকা লাগেনি?... ”

আড়চোখে জয়ন্তকে দেখে নিয়ে ভয়ঙ্কর বললে—“লেগেছিল। মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কেউ ‘মরকত ভবন,’ থেকে টেলিফোনে ওয়ার্নিং দিয়েছিল অঞ্জনাকে।”

“কারে? আপনি তাই অঞ্জনাকে গোপক খোঁজার মতো খুঁজছিলেন?”

“হৃদিশ পেলে তো খুঁজব? বিশাল কলকাতায় গেল কোথায়—”

“এসেছিল কোথা থেকে? রেজিস্টারে কী লিখেছিল?”

“কলকাতা থেকে—”

“বাস? মো ঠিকানা?”

“মো ঠিকানা!”

“বয়স তখন কত ছিল অঞ্জনার? খোঁজ নিয়েছিলেন নিশ্চয়?”

“নিশ্চয়, চবিশ, কুস্তলার সমবয়সী!”

“একটা বিষয় কিন্তু খোঁজ নেননি...”

সচকিত হলো ভয়ঙ্কর পাত্র। জয়ন্তও।

ইন্দ্রনাথ বললে— “ব্র্যাডশ আছে এখানে?”

“ব্র্যাডশ... রেলের টাইমটেবল... থানায় আছে!”

“দরকার নেই। ওই রয়েছে টেলিফোন। রেল স্টেশনেও আছে টেলিফোন, জিগ্জেস করুন, রাত দশটার পর কলকাতার কোনও ট্রেন আছে কিনা। আট বছর আগে ছিল কিনা!”

পাঁচ মিনিট পরে রিসিভার নামিয়ে রেখে শুকনো মুখে লাল চোখ আরও লাল করে তাকিয়ে রইল ভয়ঙ্কর পাত্র।

কণ্ঠে মধু ঝরিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে— “মাথা-গরম করবেন না, কলগার্লের মতো বিস্ত্রীকন্য যদি কলকাতায় যেত রাত দশটার পর, তাহলে নিশ্চয় গাড়ি নিত না... প্রেনেও চাপত না... যদিও অত রাতে প্রাইভেট প্রেনের গ্রন্থ ওঠে না... যেত ট্রেনে... কিন্তু ট্রেন ছিল না রাতো! তাহলে কনজুশন কী? অঞ্জনা ‘গ্রিনটাউন’-এই ছিল!”

“অন্য কারোর বাড়িতে পালিয়ে লুকিয়েছিল— পুলিশের ভয়ে,” বলল জয়ন্ত— “আপনার মতো করিতকর্য অফিসার তা আঁচ করলেন না?”

ভয়ঙ্করের ছ-ফুট বপু যেন কঁকুকে গেল এই দাবড়ানিতে।

ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু সুধার করণ অব্যাহত রইল— “আসলে ওঁর তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনজনের ছব্ব এক স্টেটমেন্টের জোরে।

স্বাভাবিক... খুবই স্বাভাবিক... তদন্তকে কানাগলিতে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে ইচ্ছাকৃত একই রকম স্টেটমেন্ট দিয়ে... যাতে অঞ্জনাকে জেরা করার জেদ না চাপে মাথায়... তবুও আপনি রুটিন মারফিক বোঁড়েছিলেন... ফরম্যাল তদন্ত পদ্ধতি ফলো করেছিলেন... চারজনেই তা আপাদ্জ করেছিল... টেলিফোন করে সরিয়ে নিয়েছিল অঞ্জনাকে—”

জয়ন্ত বলে উঠল— “সরিয়ে নিয়েছিল? ইউ মিন—”

“অঞ্জনা আশ্রয় নিয়েছিল এই চারজনের কারও বাড়িতে!”

“শেলটার দিয়েছিল চারজনের একজন?”

“জি, হ্যাঁ, বন্ধু!”

“কিন্তু স্যার,” বলে উঠল ভয়ঙ্কর পাত্র— “সুরেশ, চঞ্চল, চম্পা তিনজনেই থাকত ছোট ছোট ফ্ল্যাটো। তিনটে ফ্ল্যাটেই আচমকা, একই সঙ্গে, লোক পাঠিয়েছিলাম তন্ন তন্ন করে দেখার জন্যে। একই সঙ্গে সার্চ করা হয়েছে ‘মরকত ভবন’ও— মার্ভারের অস্ত্রের সন্ধান— কোনও ক্লু যদি পাওয়া যায়, সেই আশায়—”

“প্রাসাদ বললেও তো চলে ‘মরকত ভবন’ কে?”

“একটু পরেই দেখবেন—”

“অনেক ঘর?”

“হ্যাঁ!”

“একটা মেরেকে লুকিয়ে রাখা কি অসম্ভব?”

“মোটাই না, স্যার—”

“স্যার নয়, স্যার নয়—”

“ইয়ে, স্বীকার করছি, এই পরেটো আমি খেয়াল করিনি—”

“করলেও,” এ-কে ফরটি সেভেন চালিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ— “ধরুন, বাড়িটাকে ওয়াচ করাতেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। চিনতেন কী করে অঞ্জনাকে? তাকে তো কেউ দেখেননি? বাড়ির কাজের লোক সাজিয়ে যদি রাখা হত। বাড়ির সবর কানে যদি মস্ত বর্ধন করে তাকে কাজের লোক বলে চালান হত— আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ওয়াচ ভন্মে ঘি ঢালার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত!”

মুখ চুন করে চেয়ে রইল ভয়ঙ্কর পাত্র

সুপিরির অফিসারের গাঞ্জী বজায় রেখে ভয়ঙ্কর বললে— “মহাজেট! মহাজেট!”

“মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলাকেও হ'ব মনিয়ে দেওয়ার মতো।

মহাজেট”, ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে মিহরির নানা কঠিন মিটি ঝরিয়ে গেল।

[১১] মিউজিক্যাল চেয়ার

এখন ইলেকট্রনিক গেম-এর যুগ এসেছে ‘ডাংগুলি, লাটু, মার্বেল গুলি খেলার যুগ চলে গেছে। খেলতে দিলেও ‘হেই ন’ পাঁচ বছরের বাচ্চারা— কিন্তু কমিশিউটার গেমের মাস্টার এক-একজন দেখলে অবাধ হতে হয়।

একটু বড় হয়ে আমরা খেলতাম ‘মিউজিক্যাল চেয়ার’ খেলা, কলের গানের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে বসতাম গোল হলে একজন একজন করে নেচে নেচে বসে ছেড়ে রেখে



যেতাম গানের তালে তালে- শূন্য চেয়ার দখল করতে হত আর একজনকে- নেচে নেচে এসে। শেষ যে থাকত তাকে নিয়ে হত বিস্তার মজা। এই কেসে সেই মিউজিক্যাল চেয়ার-এর খেলা দেখছি, নেচে নেচে বেরিয়ে গেল চারজন- পঞ্চম জন হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে। পুরুষ-বন্ধু পরিভাষা বলা? নাকি, গুটতর কারণে?

জিগ-শ পাঙ্কল-এর চাবিকটি রয়েছে তার কাছে, কিন্তু সে কোথায়? মর্ত্যলোকে, না, শূন্যলোকে?

তথাগত ঘোষদন্ডিদারের বাড়ির দিকে ধাবমান গাড়িতে বসে মিন মিন করে আমার আনাড়িপনা দেখিয়েছিলাম ইন্দ্রনাথের কাছে। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে থাকা সত্ত্বেও, হীরক-কঠিন চোখে ও শুধু আমার দিকে তাকিয়েছিল। দুই মণি-তে দেখেছিলাম বিশূল শক্তির সঞ্চয়। নিরন্তর থেকেছে। আমিও চুপ মেরে গেছিলাম।

যদিও এই রাজ্যের প্রশাসনকেসের নাম 'রাইটার্স বিল্ডিং', তবুও রাইটারদের কোনও কদর নেই। কবিতার যদিও বা আছে, রাইটারদের কিস নেই। কবিতার বলা যায়- সর্বজ্ঞ, জ্ঞানদর্শী, নিপুণ, কুশল, বাগ্মী, চিন্তাশীল, ভাবুক ইত্যাদি। কিন্তু লেখকদের খুব জোর বলা যায় কলমচি অথবা কেরানি। 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর নাম কেন হবে না 'লেখক কুঠি'-এ নিয়ে আন্দোলন করা দরকার। আমার প্রতি ইন্দ্রনাথের সেদিনের সেই অবজ্ঞা-চাহনির ফলেই অপ্রাসঙ্গিক এই বিষয়গুলো মনের মধ্যে ভিড় করে এসেছিল। ভয়ঙ্কর পাত্র নিকর পুলিশি-টেলিপ্যাথির দৌলতে তা আন্দাজও করেছিল। তাই আচমকা প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলে গেল কবুতর কণ্ঠে। তথাগত নামধারী একদা বিশূল বিভবান পুরুষপ্রবর বর্তমানে যে নিকেতনের অধিকারী, সেটি তিনি খরিশ করেছিলেন পনেরো লাখ টাকায়। এই কল কারখানা আর খনি অঞ্চলে পনেরো লাখ বসিয়ে বাড়ি কিনতে গেলে তবিলের জোর থাকা চাই। কিনেছেন সাত বছর আগে- কুন্ডলা-তিরোধানের এক বছর পরে, বাড়িটাকে রাখাও হয়েছে বড়লোকি কায়দায়। ছোট, কিন্তু ছিমছাম। মেনটেন্যান্সের পেছনে কিন্তু রচন- কিন্তু গায়ে লাগে না তথাগত ঘোষ দন্ডিদারের। বাগান, লন- স্বকবক করছে প্রতিটা জায়গা। কোথাও আগাছা নেই, শুকনো পাতার ছুপ নেই। খরচের মা-বাপ নেই। কিন্তু চালিয়ে তো যাচ্ছেন।

"বুঝেছি কী বলতে চান," অনেকক্ষণ চুপচাপ শোনবার পর মিহরিদানা স্বরে বলেছিল ইন্দ্রনাথ- "গত সাত বছর ধরে যারা তথাগত অঙ্কলোকে গলায় গামছা দিয়ে নিংড়ে টাকা নিয়ে চলেছে, তারা তথাগতকে নিঃস্ব করতে পারেনি।"

"যা নিয়েছে, তাও কম নয়, স্যার-"

"স্যার বলছেন না।"

"মুদ্রাদোষ... মুদ্রাদোষ... সুপিরির ট্যাংলট দেখলেই স্যার, হজুর না বলে থাকতে পারি না।"

"কী মুশকিল! আচ্ছা বলুন, যা নিয়েছে, তা কম নয়?"

"কী করে কম হবে বলুন? 'মরকত ভবন' প্রাসাদটি কি কম টাকায় ছেড়েছেন? কিনেছে তো মিশনারিদের একটা অরগ্যানাইজেশন- ফরেন মানি... 'ব্রিনটাউন'-এ এমন বাড়ি আর দু'খানা নেই। তিরিশি বিঘে জমির ওপর বাগান, মাঠ, নকল পাহাড়, প্রাসাদ। ষাট লাখ- সাত বছর আগে ষাট লাখ- নো জোক। ষাট লাখ এ পকেটে ঢুকেছে, পনের লাখ ও পকেটে থেকে বেরিয়ে গেছে। পয়তাল্লিশ লাখ এখনও হাতে।"

"সূরেশ দে কি এখনও ছোট ফ্র্যাটে থাকে?" ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

"মোটাই না। এখন তার অবস্থান একটা বাংলা প্যাটার্নের সোতলা বাড়িতে। গ্যারেজ, বাগান, মালী- সব আছে। সে বাড়ির দাম তো কম নয়।"

"কেনা, না, ভাড়া?"

"কেনা।"

"কত দামে?"

"আমার ইনফরমারের খবর যদি ঠিক হয়, তাহলে দশ লাখ।"

"কবে?"

"কুন্ডলার মৃত্যুর এক বছর পরে।"

"মরকত ভবন' বিক্রির পরেই?"

"ইয়েস স্যার, সূরেশ দে চলে এল ফ্র্যাট ছেড়ে বড় বাড়িতে, তথাগত ঘোষদন্ডিদার চলে গেলেন প্রাসাদ ছেড়ে ছোট বাড়িতে।"

"এই পৃথিবীর সবচাইতে নোংরা ক্রাইম- ব্র্যাকমেলিং।"

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে- "করা হচ্ছে পাঁচজনের

একজনকে- কিন্তু সত্য গোপন করে গেছে চারজনে- একজন নিরুদ্দেশ। অর্ধ অতিশয় স্পষ্ট।

"হাঁ, জলের মতো পরিষ্কার। আমাদের টার্গেট এখন তথাগত ঘোষদন্ডিদার। তার আগে একটা কাজ বাকি। জয়ন্ত, কুন্ডলা শীলের ডেডবডি যেখানে পাওয়া গেছিল, সেই জায়গাটার আগে যেতে চাই।"

জয়ন্ত কথা বলার আগেই ড্রাইভারকে হুকুম দিল ভয়ঙ্কর।

জায়গাটা আর নিরালা নেই। আগে ছিল শহর একটু দূরে- খনি অঞ্চলের দিকে যাওয়ার পথে। এখন সেখানে সিল্প-লেন হাইওয়ে তৈরি হয়ে গেছে। ব্রিজের তলা দিয়ে নিরন্তর গাড়ি ছুটেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই ব্রিজের ওপর।

"কোথায় সেই পার্কিং স্পেস?" হেঁট হয়ে বললে ইন্দ্রনাথ।

"হাইওয়ে গিলে নিয়েছে," ভয়ঙ্করের জবাব।

"চারদিকে কোনও কোণও তো দেখছি না। ব্যাগ আর স্বার্থ বুজিয়েলেন-"

"যেখানে যেখানে - সব সাফ করে দিয়েছে হাইওয়ে।"

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল ইন্দ্রনাথ, আমার ক্ষেত্রে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আট বছর আগে... মার আট বছর আগে... যেখানে মরদেহ রেখে ওপারে চলে গেছিল চব্বিশ বছরের প্রাণবন্ত মেয়েটা- সে জায়গাটাও দেখতে পেলাম না, সময় সব মুছে দেয়।

ইন্দ্রনাথ বললে- "এবার দেখব 'মরকত ভবন'- এখনকার নার্সিং হোম।"

সে এক প্যালেস বটে, নবাবি রুচি থাকলে এমন বাসস্থান বানানো যায়। বাদশাহি বাগিচায় কাছ করছিল একজন মালী।

গাড়ির মধ্যে বসেই ইন্দ্রনাথ বললে- "এই লোকটাই কি পাথর তুলে ব্যাগ আর স্বার্থ পেয়েছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কবে?"

"এখন থাক। ও তো খুঁড়ে উদ্ধার করেছে- যে মাটি চাপা দিয়েছিল, আগে দরকার তাকে। না, তথাগত ঘোষদন্ডিদার পরে... আগে সূরেশ দে।"

স্মার্ট বাড়ি কিনেছে বটে সূরেশ দে। আর বর্ণনায় যেতে চাই না।

ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে কিছু বলেনি। দশ লাখ ন্যায্য দাম। স্থপতির বাহাদুরি আছে। যেন রাজপুতানার বুক থেকে এ বাড়ি উড়িয়ে এনে বসানো হচ্ছে এই বন আর খনি অঞ্চলের ক্যান্সার মহলে।

এই দশ লাখ বেরিয়েছে তথাগতের পকেট থেকে। আদার করেছে সূরেশ দে কোম্পানির সর্বস্বা অবস্থায় না পৌঁছে। কুন্ডলা শীল মরে গিয়ে কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে সূরেশের অনেক দিক দিয়ে। তথাগতের বিজনেস কবজা করেছে, চঞ্চল সেনের বাগদস্তাকে হরণ করেছে...

চম্পা সাহা। মহাজোটের বড় শরিক এই চম্পা সাহা। অনায়াসেই 'ডি' করেছে চঞ্চল সেনকে- কঠলয়া হয়েছে সূরেশ দে'র।

দর কষাকষিটা হয়েছিল ভালই।

আমার মতনই ইন্দ্রনাথের মনটা খারাপ হয়ে গেছিল ব্রিজে উঠে জায়গাটা দেখতে না পাওয়ায়- যেখানে তোর চারটের সময়ে লরি চালক এসে দৈখেছিল ছোট্ট ফিফটি গাড়ির চালকের আসনে দু-চোখ খুলে কুন্ডল-পুন্ডী দেখছে কুন্ডলা শীল।

ওর প্রাপের খবর আমিই শুধু রাখি। মন খারাপ হলে আমার সঙ্গেই কথা বলে। সেদিনও যা বলে গেছিল আমার কানের কাছে, একটু আগেই তা লিখলাম।

তারপরেই খুব আত্মে জিজ্ঞাস করল ভয়ঙ্করকে- "চম্পা সাহা সূরেশ দে-কে ছিনিয়ে নিয়েছিল অঞ্জন মল্লিকের কাছ থেকে, না, সূরেশ দে চম্পা সাহাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল চঞ্চল সেনের কাছ থেকে- সেটা পরিষ্কার হয়ে যেত যদি পাওয়া যেত অঞ্জন মল্লিককে।"

"আমাদের ব্যাড লাক, স্যার। তবে, বাগেনিংটা হয়েছিল ভালই। এ

ক্রিমিন্যাল গেম অফ মিউজিক্যাল চেয়ার।"

"আপনি অঞ্জন মল্লিককে দেখেননি?..."

"নো, স্যার।"

"বাকি দুটো মেয়েকে তো দেখেছিলেন। তিন কন্যার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে ছিল?"

"অঞ্জন মল্লিক, চম্পা সাহা আর কুন্ডলা শীল- ইনফরমেশন যা পেয়েছি,



তার জোরে বলা যায়, সব চাইতে গ্রাম্যমারস গার্ল ছিল অঞ্জনা মল্লিক।”

“গ্রাম্যমারস! শুভ। তখন তার বয়স চব্বিশ?”

“আজ্ঞা!”

“সুন্দরী কে ছিল? রিয়াল বিউটি?”

“চম্পা সাহা। চেহারায় আর মনের জোরে শক্ত।”

“কুন্তলা শীল এই তিনজনের মধ্যে সবচাইতে কম পরেই পাচ্ছে বিউটি কনটেস্ট?”

“হ্যাঁ, স্যার। বিউটি কনটেস্ট। বলেছেন ভাল। আট বছর আগে অবশ্য এইভাবে হাটে রূপ দেখানোর রেওয়াজ ছিল না। থাকলে—

“চম্পা সাহা মিস গ্রিনটাইন হতে পারত?”

জবাব না দিয়ে জানলার দিকে আঁতুল তুলে বাইরে দেখালো ভয়ঙ্কর।

“চম্পা সাহা, এখন, চম্পা দে।”

### [১২] বর্শামুখ তদন্ত

গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক পারফেক্ট বিউটি। অঙ্গরাসের নাকি বয়স বাড় না। এই নারী রক্তকে দেখেও বরিশ বছর বয়স বলা যায় না। ‘ফটক পেরিয়ে এসে ধমকে দাঁড়িয়েছে। হাতে শপিং বাস্কেটে চোখ নামিয়ে দেখছে। নিশ্চয় ভুল করে কিছু বাড়িতে ফেলে এসেছে। হাত ঢুকিয়ে দেখল। পেল না। পরমুহূর্তেই ঘুরে গিয়ে ফের ফটক পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই গাড়ি বারাদার তলা থেকে হনহনিয়ে এগিয়ে এল এক উত্তমকান্তি ভদ্রলোক। সুগঠন আকৃতি, পরনে সিল্কের পায়জামা আর পাঞ্জাবি, বোতাম নিশ্চয় হীরের। বাড়ির ভেতরে আটপৌরে পোশাক যার এত মূল্যবান, তার পকেটের রেশ আদ্যাক করা কঠিন নয়। বলিষ্ঠ তার ব্যক্তিত্বও। প্রতি পদক্ষেপে বিবৃত অহং ভাব। কর্তৃত্ব। আত্মবিশ্বাস।

কানের পাশে আস্তে বললে ভয়ঙ্কর— “সূরেশ দে।”

চম্পার দিকে হাত বাড়িয়েছে সূরেশ। হাতে বানকয়েক বাম। আনতে ভুলে গেছিল চম্পা। সূরেশ নিজেই বেরিয়ে এসে গাছিয়ে দিল চম্পার হাতে, চম্পা রাশল শপিং বাস্কেটে। একটু হাসল। বিউটির বিদ্যুৎ খেলে গেল বাগান-পথে। দীর্ঘ পদক্ষেপে ‘এই আমি’ ব্যক্তিগত ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। বাগান পথ বুঝি কুতারা হয়ে গেল তার চরণ স্পর্শে।

বাতাসের সুরে বললে ইন্দ্রনাথ— “এবার তথাগত ঘোষদণ্ডিদার।”

‘মরকত ভবন’-এর তুলনায় এ বাড়িকে একটা কটেক্স বললেই চলে। কিন্তু তা কুবের কটেক্স।

সদর দরজা খুলে ধরল যে ভদ্রমহিলা তার বয়স তিরিশের নিচে নয়, পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়। পরনে পিঙ্ক কালারের টেলার-মেড শালায়ার কামিজ। শরীরের উচ্চাভিলাষিক অনুপাত দেখতে মর্দাণ দেওয়া হয়েছে। হেয়ারকট আধুনিক। বিউটি সেলনের ছোঁয়া আছে। চাহনি শক্ত। ভাঙ্গী চেহারা। কিন্তু নিম্নে। মাথোজোঁষে সঠিক। তনু ঘিরে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ। চটক আর চমকে পোক্ত। দুই চোখ যেন দুটি বৈদ্যুত মণি। ঈষৎ ঘূসর।

তথাগত ঘোষদণ্ডিদারের জীবনে অন্য এক নারী। ভয়ঙ্কর পাত্র-র মুখ দেখেই তা বুঝেছিলাম। পরে ওর মুখেই শুনেছিলাম। জবরদস্ত টাইপের এই নারীকে আট বছর আগে সে দেখেনি।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল কক্ষকায় মহিলা। পুলিশ দেখে ডরায়নি। বরং আরও একটু কড়া হয়েছিল চৌকোনা চোয়াল। একটু স্ক্রীদ হয়েছিল নাকের পাটা। বাঁশির মতো নাক। শাণিত। ঈষৎ বক্র। টিয়াপাখির চকুর মতো।

রাশভারী গলায় বলেছিল ভয়ঙ্কর পাত্র— “তথাগত ঘোষদণ্ডিদার আছেন?”

“আছেন, শঙ্খধনি স্বরে আপায়নের লেশমাত্র নেই।

“দেখা করতে চাই।”

“দাঁড়ান।”

ভদ্রমহিলা বিশালকায় হলেও আবেদনময়ী। তিরিশোর্ধ বয়েসেও। নিয়মিত প্রসাধন পারিপাট্যের চর্চা আছে। মেসেরা কুড়িতে বুড়ি কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তার ব্যতিক্রম। প্রথম রিপূর প্রতি প্রীতি আঁতে, চোখের ম্যাগনেটে সেই আকর্ষণ।

ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের দিক দিয়েও বটে। ভয়ঙ্কর পাত্র রাণ রাজার বংশধর বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাকেও কোয়ার করল না ভদ্রমহিলা। চৌকাঠ পেরতে দিল না। সদর দরজা মুখের ওপর বন্ধ করে দিল।

আমরা চার মৃত্যুমান বাইরে বোকচন্দরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা নারী আপোলন করে কিনা জানি না, তবে পুরুষ জাটটাকে নিচে রাখতে জানে। ব্যক্তিগত আর বরতনুর প্রতিটি পরমাণু দিয়ে। যদিও সীমস্তে

নেই সিঁদুর রেখা।

মুদু স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ— “জিজেস করতে গেল তথাগতকে— পুলিশের সামনাসামনি হবে কিনা।”

জয়ন্ত উৎকট গম্ভীর হয়ে বললে— “হয়তো কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতেও গেল— হঠাৎ হানা দিয়েছি যে।”

“কিন্তু চমকে তো গেল না।” ভয়ঙ্করের সূচিস্থিত মস্তব্য।

খুলে গেল সদর দরজা। নিখুঁত অবয়বী কক্ষকায় ভদ্রমহিলা ফের

আবির্ভূত হয়েছে দরজা জুড়ে। শঙ্খধনি বললে— “আসুন।”

বড় কম কথার মানুষ বটে এই মহিলা। কথায় নয়, স্বরে— ওই শঙ্খ সুব দিয়ে পুরুষের শরীরে শিহরণ জাগাতে পারে। কবিতা ক্ষিপ্ত হবে জানি, কিন্তু যা সত্য তা গোপন করি কী করে?

আমাদের স্বাগতম জানাল বৈদ্যুত মণি অক্ষি অধিকারিণী, কিন্তু দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল না। শঙ্খস্বরে কাঁচাকাটা ভাবে বললে— “উনি রেন্ট নিচ্ছেন। তবুও দেখা করবেন।”

বলে, থামল। বৈদ্যুত চকু পর্দায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করে নিল প্রত্যেকের মুখভাব। কিন্তু আমাদের চৈনিক মুখে কোনও ভাবান্তর দেখতে পেল না।

বললে পরক্ষণেই, শঙ্খস্বরে এবং নিম্নগামে নামিয়ে— “ওঁর শরীর খুব ভাল নয়, বেশি সময় নেবেন না। বেশি কথা বলাবেন না।”

গৃহকর্ত্তীরাই এইভাবে নোটস বুলিয়ে দেয় অনাহতদের নাকের ওপর। আমরা গায়ে মাখলাম না। পুলিশ প্রয়োজন হলে ভিজ্ঞে বেড়াল হতে পারে। আমি তো হবই। কারণ আমার দৌড় কলম পর্যন্ত।

বসবার ঘরে ঢুকে বুঝলাম, অভিযোগ্যক্তি করেনি বৈদ্যুত-নয়না।

হুইল-চেয়ারে বসে রয়েছেন তথাগত ঘোষদণ্ডিদার, ক্লাস্ত চোখে চেয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। লুপ্তির মতো পরেছেন সাদা খুঁটি। গায়ে সেকালের জমিদারদের বোতামবিহীন গরদের পাঞ্জাবি— বুকের বাঁ দিকে ঈষৎ খোলা। দাড়ি গাঁক নিখুঁত ভাবে কামানো। নিশ্চয় কেউ কামিয়ে দেয়। এই অক্ষয়

শরীরে শেভিং-এর বক্সাট নিত্য ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কঙ্কালসার আকৃতি। কলার বোন বেরিয়ে আছে। হনুর নিচে গাল ডুবড়ে গেছে। খুব ফর্সা, কিন্তু ফ্যাকাসে। রক্তভা নেই। মাথার লম্বা লম্বা চুল সাদা। আপাদমস্তক তিনি শুভ। যেন একটা শ্বেত জ্যোতির মণ্ডল পরিবৃত্ত। বিবাদের কালিমা শুধু দুই

চোখে। সে চোখের জ্যোতি পাটে বসেছে।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, যেন একটা প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্থপ দেখছি। আমি লেখক মানুষ। লাক্সিবিলাস আমাকেই মানায়।

আরক্ষা বাহিনীর দুই অফিসার শাল বক্সের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দু-হাত তুলে কাঠ-নম্রকার করতেই হুইল চেয়ারে আসীন ভগ্নপ্রাসাদ সবিনয়ে তা ফিরিয়ে দিলেন। দেখলাম, তাঁর আঙুল কাঁপছে।

ইন্দ্রনাথ এসব শুভ বৌদ্ধিকতার ধার দিয়েও গেল না। সূচ্যগ্র চোখে শুধু চেয়ে রইল শ্বেতমূর্তির দিকে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম।

শ্বেতমূর্তি বললেন— “আপনারা বসুন।”

আসন গ্রহণ সমাপ্ত হল নীরবে।

তারপর নীরস স্বরে বললে ভয়ঙ্কর পাত্র কাশী কামিনীকে দেখিয়ে—

“একে এখন যেতে বলুন।”

তথাগতকে কিছু বলতে হলো না। গোলাপী শালায়ার কামিজ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হুইল চেয়ারের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা অর্ধচন্দ্রাকারে বসলাম। ইন্দ্রনাথের হীরে চোখে এরকম দীপ্তি বহুলা দেখিনি। যেন হিপনোটিক রশ্মি ঠিকরে যাচ্ছে। চোখই ত্রেনের একমাত্র বেরিয়ে থাকা অংশ। চোখের চেহারা দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে দেড় কেজি মগজের লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষে কী বিপুল পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি সংহত করেছে ইন্দ্রনাথ রত্ন। আসল কথা-যুদ্ধের

জন্মে...

আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

ভয়ঙ্কর বললে— “আমাকে চিনতে পারছেন?”

আশ্চর্য। গলা একটুও কাঁপল না তথাগত ঘোষদণ্ডিদারের— “আট বছর আগে এসেছিলেন... ইম্পের্টর... ইম্পের্টর...”

“অভয়ঙ্কর তলাপাত্র।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্যাড... ডেরি স্যাড... মেয়েটাকে কে যে মেরে গেল—”

“মেরে তো যায়নি। হার্ট অ্যাটাক।”

“মেডিক্যাল রিপোর্ট তাই। কিন্তু আপনাদের সম্মেদ ছিল—”

“মার্ভার!” ভয়ঙ্করের স্বর নিঃশব্দ।

অশুপল নৈঃশব্দের পর সবিনয়ে বললেন তথাগত— “উঠে দাঁড়িয়ে যে আপনাদের সমাজ জানাব, সে ক্ষমতা আমার নেই। এঁদের পরিচয় তো পেলাম না?”

উনি পরিচয় চাইছেন আমার, ইন্দ্রনাথের আর জয়ন্তর। “মার্ভার” শব্দটা কর্ণগোচর হওয়ায় সত্যক হয়েছেন।

আমি কিন্তু সজ্ঞ হলাম। পুলিশি তদন্ত আমার আর ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি থাকবার অধিকার আইনত নেই।

কিন্তু সেদিকেই গেল না ভয়ঙ্কর। বড় চতুর। পুলিশি কখনও খুঁটি পাঞ্জাবি পরে তদন্ত করতে যায় না, তথাগত সেই পর্যায়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু

আইনের পাঞ্জা যুদ্ধে গেলই না ভয়ঙ্কর।  
বললে— “ওরা আমাদের সতীর্থ,” বলেই, তথাগতের হৃৎকম্পন ঘটানোর জন্যে দেখাল জয়ন্তকে— “ইনি স্পেশ্যাল সেল-এর চিফ। মার্ভার কেসে এক্সপার্ট। জয়ন্ত চৌধুরী।”

আবার অশুপল নীরবতা। তারপর সত্যক স্বরে তথাগত বললেন—  
“আপনারা তাহলে এখনও বিশ্বাস করেন, কুন্ডলা শীলকে মার্ভার করা হয়েছিল?”

“করি।”

“আট বছর পরেও?”

“হ্যাঁ।”

প্রশান্ত স্বরে কথা বলে যাচ্ছেন তথাগত। উদ্বোধক অজনিহিত রেখেছেন। কঠিন ঠাই। এই ভয়ঙ্কর নিয়ে খেলছেন ভালই।

নিশ্চয় তা বুঝেই ইন্দ্রনাথ ওর শব্দ চাহনিকে হঠাৎ নরম করে আনল।  
খোলা গুরু হল সমানে সমানে।

বললে অমায়িক গলায়— “আট বছর আগে পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে যা-যা বলেছিলেন, তা পড়লাম আপনার টেপেমেটে।”

তথাগত বললেন— “বলেছিলাম, রাত নটা নাগাদ কুন্ডলা শীল বিদায় নেয়। তার আগে আমি কয়েকটা চিঠির ডিকটেশন দিয়েছিলাম, তা শর্টহ্যান্ডে লিখে নেয়— ডিনারের পর। যাওয়ার সময়ে চার হাজার টাকা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে কয়েকটা বিল পেমেণ্টের জন্যে। টাকা রেখে দেয় হ্যাণ্ডব্যাগে। সূরেশ সে, চক্কল সেন আর চম্পা সাহা— তিনজন গেণ্ট— তা দেখেছে। হ্যাণ্ডব্যাগ কাঁখে খুলিয়ে আর গলায় দ্বার্ক বেঁধে কুন্ডলা শীল যখন বেরিয়ে যাচ্ছে— তখনও তাকে ওই অবস্থায় দেখেছে এই তিনজন। ফিয়াট চালিয়ে চলে যেতেও দেখেছে। সেই রাতেই মারা যায় কুন্ডলা শীল।”

“সজীব কুন্ডলা শীলকে শেষ দেখেছে এই তিনজন?”

“হ্যাঁ।”

“আপনি তখন প্রাইভেট চেষ্টারে ছিলেন?”

“হ্যাঁ।”

“অল্পনা ময়িক— আর একজন গেণ্ট— কোথায় ছিল?”

“অল্পনা ময়িক,” একটু যতি দিলেন তথাগত, খুব সামান্য— “সেভিজ টমলেটে।”

“কুন্ডলা শীল সে রাতে আর ফিরে আসেনি? আপনি সিওর?”

“সিওর।”

“হয়তো আপনি জানেন না—”

“আমার বাড়িতে কুন্ডলা শীল ফিরে এলে আমি জানব না, তা কী হয়?”

“কুন্ডলা শীল চলে যাওয়ার পর চারজন গেণ্ট ছিল আপনার বাড়িতে?”

“হ্যাঁ।”

“কতক্ষণ ছিল?”

“রাত বারটা পর্যন্ত।”

“রাত নটা থেকে রাত বারটার মধ্যে কুন্ডলা শীল ফিরে এলে—”

“ওদের চোখে পড়ত।”

“কী করছিল তিনজন?”

“ব্রিজ খেলছিল।”

“কুন্ডলা শীল ফিরে এসে অন্য দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে জানবে কী করে?”

“জানলার ধারে বসেছিল। শোর্টকোর সামনে, গাড়ি ঢুকলে জানতে পারত।”

কাঁচা মিথ্যে বলে যাচ্ছেন তথাগত। চোখের পাতা একটুও কাঁপছে না। মনের ওপর চাপ পড়ছে, অথচ বাইরে প্রকাশ করছেন না। স্ববিকল্প মূর্তি।

শব্দ ধাত। সেখানে সেখানে কোলাকুলির সেই দৃশ্য জীবনে ভুলব না।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ— “কুন্ডলা শীল মারা যাওয়ার পর ‘মরকত ভবন’ বেচে দিলেন?”

“এক বছর পর।”

“কেন?”

“আমার একার পক্ষে বড্ড বড় বলে। তাছাড়া রিটার্নার করব ঠিক করেছিলাম।”

ইন্দ্রনাথ কথার পাঁচো কোণঠাসা করছে বটে তথাগতকে, কিন্তু পদে পদে পিছলে যাচ্ছেন অলোক, কথার খোকড়া। অল্প কথায় মূল পরেন্ট ধরে রেখেছেন, বিদ্যুতি ঘটতে দিচ্ছেন না।

মোক্‌ম পর্যায়ে চলে এল ইন্দ্রনাথ— “আপনি থিওরেটিক্যালি রিটার্নার করলেন— বিজনেসের ভার তুলে দিলেন সূরেশ দে’র হাতে?”

“হ্যাঁ,” শান্ত জবাব তথাগতর।

“পার্টনার ছিলেন বলে?”

“এটা পার্টনারশিপ বিজনেস নয়।”

“আপনিই প্রোপাইটর?”

“হ্যাঁ। এখনও।”

“তাহলে সমস্ত দায়িত্ব সূরেশ দে-কে দিলেন কেন?”

ম্লিষ্ট হাসি হাসলেন তথাগত। স্বর্ণীয় হাসি। যেন করুণার অবতারণা।  
পরোপকার পরমধর্ম।

বললেন— “বয়েসের যারাক থাকলেও সূরেশ আমার বন্ধু, বিশ্বস্ত।  
জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার হয়ে বিজনেসে ম্যানেজ করতে পারবে কিনা।  
রাজি হয়েছিল। প্রেমোশন দিয়ে সুপ্রিম অথরিটি দিয়েছিলাম। রেজাল্ট ভালই  
হয়েছে। আমি খুশি।”

খুশি তো সূরেশ দে নিজেরও— মনে মনে বলেছিলাম আমি। ইংরেজিতে  
একটা প্রবাস আছে, হিপি হবি যে প্রবাস নিয়ে ফ্যানটাসি বানিয়ে বাজার  
ধরেছে— এও তো তাই। হেঁড়া কাঁধা থেকে সোনার খাঁট। প্রাপ্যের অধিক  
পাওয়া...

ইন্দ্রনাথ ঠিক এই পর্যায়েই চেপে ধরল তথাগতকে— “অনেক বেশি  
পাওয়া হয়ে গেল না? জুনিয়র এক্সিকিউটিভ থেকে এক লাফে বকলমে  
মালিক?”

খির চোখে চেয়ে রইলেন তথাগত।

থেকে রইল না ইন্দ্রনাথ— “সেই সঙ্গে ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অত্যন্ত  
অদ্ভুত ব্যাপার। চক্কল সেনের শাপদন্ডাকে বিয়ে করে বলল সূরেশ দে।”

তথাগত নিম্নীলিত নয়ন।

ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীব্র— “নিজের গার্ল ফ্রেন্ডকে হটিয়ে দিয়ে  
পরের ভাবী বউকে হরণ। ষ্ট্রেন? নর কী?”

তথাগত এখন প্রকৃতই তথাগত। বৃদ্ধ।

কিন্তু দ্যুতি জাগ্রত হয়েছে ইন্দ্রনাথের হীরে চোখে— “চাঁচাছোলা সিদ্ধান্তটা  
এই : আপনার বর দুজনেরই উপকার করেছে। চম্পা সাহার আর সূরেশ  
দে-র।”

নিরীহ চোখে, নিষ্পলক চোখে ডাকিরে থেকে তথাগত বললেন—  
“ঝেড়ে কাশুন।”

আমর মন বলল, হাতুড়ি মারবার সময় এবার হয়েছে। জোরার বাঘবন্দী  
আক্রমণ সফল হয়েছে। তথাগতকে ঠেলতে ঠেলতে খাদের কিনারায় নিয়ে  
এসেছে ইন্দ্রনাথ রুহ।

বলল নিরুপদ স্বরে— “যে তিনজন কুন্ডলা শীলকে নটার সময়ে বেরিয়ে  
যেতে দেখে আপনার গল্পকে সাপোর্ট করেছে, সূরেশ দে আর চম্পা সাহা  
সেই তিনজনের মধ্যে দুজন।”

তথাগত প্রশান্ত।

ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে অশনি-সম্ভেদ— “চারজনের মধ্যে একজন সেই রাতেই  
নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।”

কোলের ওপর দু-হাত জড় করে বসেছিলেন তথাগত। দেখলাম,  
আঙুলের ডগাগুলো খির খির করে কাঁপছে। কাঁপছে মুখের পেশিও। খুব  
অল্প। এই বয়েসে এতটা প্রকৃতিস্থ থাকা কম ক্ষমতা নয়। কথা যখন  
বললেন, গলার স্বরে ডিলমার কাঁপুনি লক্ষ্য করলাম না। হিমাদ্রিপ্রতিম এই  
উটলতা সতিহিই বিশ্বাসকর।

বললেন— “আপনি বলতে চাইছেন, আমি যা বলেছি, তা মিথ্যে গল্প।  
চম্পা সাহা আর সূরেশ দে এই মিথ্যে গল্পকে সমর্থন জানিয়ে উপকৃত  
হয়েছে— যেভাবেই হোক। কোন ইনফরমেশনের ভিত্তিতে এই ধারণা

আপনাদের মাধ্যম এল, তা কি জানতে পারি?”

সেহাঁহরে পড়ল হাতুড়ির খিঁচির বা—হরতো নক-আউট বা—“কুতলা শীল-এর হাতুড়িগান আর স্বাক্ষর পাওরা গেছে।”

তথাগতর চোখের পাতা কি ইশ্পাত দিয়ে তৈরি? একটুও কীপল না কেন?

কীপল না তখনও, বশন ব্রিফকেস খুলে ময়ূরকন্তী ব্যাগ আর স্বাক্ষর বের করে জরুর হাতে দিল ভয়ঙ্কর। ব্যাগ খুলে কুতলা শীলের শটহাত নেটবুক বের করল জরুর—নিখর রইল তথাগতর চোখের পাতা। নেটবই তথাগতর কোলে ফেলে দিল জরুর—অচকল রইল চোখের পাতা, স্বাভাবিক কৌতুহলে নেটবই উলটে পালাটে দেখে কিরিয়ে দিলেন জরুর হাতে। প্রাণশীল একটি মেয়ের কাছ থেকে যে এই বস্তু তিনি নিয়ে এসেছেন, সেরকম কোনও লক্ষণ প্রকাশ করলেন না চোখে মুখে।

এইবার নির্ধাৎ কাইন্যাল আর তৃতীয় হাতুড়ি-বা মারল ইশ্বনাথ—  
“এগুলো পাওয়া গেছে আপনার বাড়িতে—‘মরকত ভবন’রে। লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বাগানে একটা পাথরের তলায়—বলুন এবার আপনার বক্তব্য।”

বক্তব্য রাখলেন তথাগত শোষকদ্বিধার—আশ্চর্য দৃঢ়তার।

“আমার বাড়ির বাগানে পাথরের তলায় কে লুকিয়ে রেখেছিল, তা আমি কী করে জানব?

“বদি বলি, আপনিই লুকিয়ে রেখেছিলেন?” ইশ্বনাথের স্বরে রুদ্রবীণার টঙ্কার।

“তাহলে বাড়ি বিক্রির আগে নিশ্চয় সরিয়ে ফেলতাম। এরকম পঞ্জিগত প্রক পাথরের তলায় রেখে বাড়ি বেচতাম না। আগে সরাতাম।”

ইশ্বনাথ থমকে গেল। দাবার খুঁটি চলছে ভাল।

তথাগত মোলায়েম গলায় বললেন—“সরমাকে ডাকি। একটু চা-কফি হোক।”

বলেই, হইল-চেয়ারের পাশের টেবিলে রাখা বেল পুশ করলেন। প্রার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। বেন দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে কান পেতেছিল কালোবরক কামিনী।

কফির অর্ডার দিলেন তথাগত।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ইশ্বনাথ বললেন—“আপনার গেরস্থালির সব ভার একেই দিয়েছেন?”

“হ্যাঁ।”

“পুরো নাম কী?”

“সরমা সরকার।”

“অনেক দিন আছে?”

“তা প্রায় বার বছর তো বটেই।”

দরজা খুলে গেল। কফি এল।

[১৩] মিনি ক্যামেরার কেরামতি

যে-টেবিলে পুশ বেল টিপেছেন তথাগত, হাতের কাছেই সেই লাল পাথরের টেবিলে কফি-বিবৃটের ট্রে যখন নামিয়ে রাখছে সরমা সরকার একটু ঝুঁকে, ইশ্বনাথ তখন সিগারেট ধরাচ্ছে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে। প্রথম টিপুনিতে সাদা কাঠি অগ্নিগ্রহণ করল না। সরমা যখন সিনে হয়ে দাঁড়িয়ে ইশ্বনাথের দিকে চোখ তুলেছে, খিঁচির টিপুনি দিল ইশ্বনাথ। সিগারেট ধরে গেল।

একই সঙ্গে দুটি বিভিন্ন বিষয় লক্ষ করে গেলাম আমি।

প্রথম, ইশ্বনাথ ‘কাঁচি’ সিগারেট ডক্ত ছিল এককালে। তারপর ‘কাঁচি’র বাজারে আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইশ্বনাথ তাম্বাকুরের রকমারি প্রকরণে নেশা অন্বেষণে রসে গিল। বর্তমানে চলছে ইশ্বনাথ-কিগারেট নয়।

অথচ, সেদিন ও পকেট থেকে বের করল ক্যানসারের এই অগ্রদূতকে।

খিঁচির, ইশ্বনাথ প্রকৃতই সুন্দর। টানা টানা চোখ, কবি-কবি চেহারা, বলিউড-টলিউড-হলিউড গরম করে দেওয়ার ক্ষমতা ওর চোখে, মুখে, কথার, চেহারায় আছে। কিন্তু ললনা-মহলকে ও এড়িয়ে চলে। অভিনয় ক্ষমতা আর বাকপটুতা দেখার গোয়েন্দাগিরির সময়ে-রূপালি দুনিয়ার বহু ভালোবের বাড়ি ওকে নোয়াতে পারেনি। লাইনে ঢোকাতে পারেনি।

এহেন ইশ্বনাথের পানে বৈদ্যু-নয়না কাজের মেয়ে সরমা সরকারের সটান চাহনি আমাকে বিস্মিত করেছিল। স্পর্ধা তো কম নয়।

শেষ ইশ্বনাথের। ও কেন শরীরী চুচক।

আঁখি-শরের পলক-মলক তুলেই ধর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল নারীজাতির শেখোক্ত প্রেমীর সেই নয়না-যার চলনে-দুলনির মধ্যেও বাৎসায়ন-চটার আভাস।

আমি অবাক গলাতেই বলেছিলাম ইশ্বনাথকে—“কাঁচি ছেড়ে এখন কী?”

“বেনসন হেজেন,” লাইটার পকেট রাখতে যাচ্ছে ইশ্বনাথ—হাত বাড়াল জরুর। দামী সিগারেট দেখে শব্দ হয়েছে পুলিশ প্রবরের। লাইটার আর প্যাঁকেট ওর হাতে গহিরে দিয়ে একমুখ খোঁচা ছেড়ে কফির কাপ তুলে নিল ইশ্বনাথ।

কিন্তু মুখে কথিতে চুমুক দিলেন যেতমুর্তি তথাগত। ডিলমার টলেননি। বললেন—“আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে? থাকলে বলুন, খোঁচা কাটিয়ে দিচ্ছি।”

ইশ্বনাথ স্যাকারিন-হাসি হেসে বলে গেল—“এসেছিলাম এক খিওরি নিয়ে। ভেবেছিলাম, কুতলা শীল মারা গেছিল ‘মরকত ভবন’, মাথায় চোটা পাওয়ার পর হাট্ট অকৃত্য হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে জবাবদিহি দিতে হবে আপনাকে। সুরেশ সে আর চম্পা সাহা এই মৃত্যু-বিবরণ বড় বেশি জেনে ফেলেছিল বলেই আপনি ঝাঁপরে পড়েছিলেন। তাদের মৃত্যু রাখার দরকার ছিল। সিক্রেট থাকুক ক্যামিলির মধ্যে—এই চুক্তি নিয়ে বিয়ে করেছিল সুরেশ আর চম্পা—দুই পার্টনার। সিক্রেট হাতে সিক্রেটই থাকে, তাই কোম্পানির সর্বস্বয় কর্তৃত্ব এদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপনি। দিতে পিরে টাকার টান পড়েছিল। বড় বাড়ি বেচে দিয়ে ছোট বাড়ি কিনেছিলেন। কিন্তু খিওরি উপরতো করে দিলেন আপনার একটা কথায়। বেচেই যখন দিলেন, পাথরের তলা থেকে হাতুড়িগান আর স্বাক্ষর তুলে নিয়ে গেলেন না কেন? আচ্ছা, এখন আসি।”

স্বর্ণীয় হাসির বিকস্রণ ঘটিয়ে শুধু চেয়ে রইলেন তথাগত। বেল টিপলেন। সরমা সরকার আমাদের সমর দরজার বাইরে নিয়ে গেল। তখন বৈদ্যুনি চোখের ওপর ইশ্বনাথ তার হৃয়ক-চক্ষু নিবদ্ধ করে রাখল সেকো করে। কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। টেলিগ্যাথিক মেসেজ।

[১৪] বৈদ্যুনি মনির রহস্য

গাড়িতে উঠে বসেই ইশ্বনাথ বললেন—“ভয়ঙ্কর, ফিশটার ডেভলাপিং, প্রিটিং, এনলার্জমেন্ট চাই এক ঘটনার মধ্যে।”

জয়ন্ত সিগারেট লাইটারটা পকেট থেকে বের করে দিল ভয়ঙ্করের হাতে—“চাই এক ঘটনার মধ্যে।” আর কোনও কথা নয়।

ভয়ঙ্করের লাল চোখে তারিফের লহরী বেলে গেল—“কুইক কুইক শটার মারলেন, স্যার। খটখট দুবার। লেটেষ্ট মডেল?”

ইশ্বনাথ বললেন—“হ্যাঁ।”

আমি হতভম্ব হয়ে শুধু দেখে গেলাম লাইটাররূপী মিনি ক্যামেরাকে। ইচ্ছে করলে পুলিশ সব পারে, ভারত সরকার টেকনিক্যাল ইনস্পেক্টর জেনারেল অন্যান্য ইন্সপেক্টর বুদ্ধি ধার করলে তাহলে। কিন্তু ওরকম রহস্য আছে এ দেশেও। তাই এক ঘটনা নয়, মাত্র আশ ঘটনার মধ্যে লাইটাররূপী মিনি ক্যামেরা এইট মিশ্রিমিটার ফিশের ডেভলাপিং-প্রিটিং-এনলার্জমেন্ট হয়ে গেল। ভয়ঙ্করই সোকানের সামনে গাড়ি ঝড় করিয়ে রেখে নিজে ভেতরে গিয়ে ভার্ক ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিয়ে এল। কুল সাইড এনলার্জমেন্ট ড্রায়ারে ফেলে শুকিয়ে খটখটে করে এনেছে।

হাত বটে ইশ্বনাথের। এত ক্রোভ রেভে ভিডি কাইডারে চোখ না রেখেই শুধু আঙ্গাজে যোগদাস করেছিল। দুটো ছবিতেই বসিনী হয়েছে সরমা সরকার। প্রথম ছবিতে মুখ নামিয়ে রয়েছে—কোথা বাছে মুখের পার্শ্বরেখা—টিলাপাখি নাক বেশি স্পষ্ট। খিঁচির ছবিতে সোজা চেয়ে রয়েছে ক্যামেরার দিকে। দুটো চোয়াল এই ছবিতে বেশি স্পষ্ট, স্পষ্টতর চোখের চাহনি। ক্যাটস আই চোখের গহনে মশালের আভাস। এই লাহিকা শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েই মুনিখবিসেরও অসংযমী করে তোলে স্বর্ণসভার অলংকার-রা...

ইশ্বনাথ বললেন—“এবার...”

জয়ন্ত বললেন—“কোথায়?”

গাড়ি এসে থামল সেখায়। দরজার মাথায় বোর্ডে লেখা রয়েছে ‘লেডিজ হোস্টেল’।

ভয়ঙ্কর বললেন—“স্যার, এই সেই কলগার্ড হাউস। এখান থেকেই রাত দশটায় অঞ্জনা মল্লিক চলে গেছিল কলকাতার।”

নসি়া নিল ইশ্বনাথ—“অফিস ঘরে চলুন।”

“আপনিই ম্যানেজার?” প্রশ্নটি ইশ্বনাথের।

“হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার,” জবাবটি দিলেন যে স্রৌঢ় রমণী তাঁর কপালে আধুলি সাইজের লাল টিপ, সীমন্তে রেডরোড মার্কা সিঁদুরের বিভাজন,

পরের চওড়া লাল পাড় শাড়ি— বেন, মণিরে গুজো দিতে যাবেন এখনি। লোবের মধ্যে স্ট্রোয়ার কটর বড় বেশি খাতব— বনখানে রপরশে। চোখের তারা পারার মতো পিঙ্কি। তবে ভয় ভরসা নেই ননি। পুলিশ দেখে ভিরমি খাওয়ার পাত্রী নন। উলটে একটু তেড়েই উঠলেন— “অনেক মেয়ের সামান্যবান দেখতে হয় আমাকে। আপনাদের দেখলে এখনি শোরগোল উঠবে। হোস্টেলের বন্যাম হবে। দরজা করে দরজাটা ভেঙিয়ে দিন।”

“আমরা অনেক মেয়েরকে তো ছাই না,” দরজাটা ভেঙিয়ে দিয়ে জরতকে বলল ইন্নাথ— “তুই এখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়া।” ভরতরকে বললে— “আপনি নিজে পারছেন এই ভরতহিলাকে?”

ভরতর বললে ভরতর গলার— “আলবৎ পারছি। আট বছর আগে এই সন্দেশ কথা বলে গেছিলাম।”

“ওরকম রোখা গলার কথা বললে বামেলার পড়বেন,” মিহি গলার বলে গেল ইন্নাথ রুজ— “এ দেশে বর্তমানে নারী রক্ষার, নারীর স্রীলতা রক্ষার, নারীর মর্যাদা রক্ষার এককুড়ি আইন আছে। নারী অপকর্ম করলেও পার পেয়ে যাবে, জামিন-অবোধ্য অপরাধ করলেও জামিন মঞ্জুর হবে, পাপ-পঙ্কে ভুগে থাকলেও খোয়া তুলনীপাতা হয়ে যাবে, এমনকি মার্ডার করলেও খালাস পেয়ে যাবে— অথবা, গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। তাই না, ম্যাডাম?”

প্রথমবা নিকিণ্ড হল বীর দিকে, সেই অচলারতন ভরতহিলা শুধু একটু নাসিকাকুন করলেন— মুখের অনুপাতে নাকটা একটু বড় হওয়ার আনন-স্রী খুব একটা খোলতাই হল না।

ইন্নাথ কিছু মিষ্টি-মিষ্টি গলার গুঁড়ো লম্বা ছড়িয়ে গেল প্রতিটি বচনে— “আট বছর আগে এক সোমবারে রাত দশটার আপনার এই লেডিজ হোস্টেল থেকে একটি মেয়ে হঠাৎ চলে গেছিল কলকাতার। মনে পড়ছে?... ”

“আমি কি কমপিউটার? অত মনে নেই।”

“মনে করিয়ে দিচ্ছি। একটা পার্টিতে গিয়েছিল আপনার সেই বোঁড়ার—”

“কে কোথায় যাব, বলে তো বার্তা—”

“তা ঠিক, তা ঠিক, নিত্য নতুন নাগরের সঙ্গে অভিসার থাকলে বলে যাওয়া যায় না, কিন্তু এই মেয়েটি যে পার্টিতে গেছিল, সেই পার্টির একটা মেয়ে—পেট জ্বালা বাড়ি কিরতে পারেনি... মনে পড়ছে?... তার নাম ছিল কুন্ডলা... কুন্ডলা শীল...”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ গো মশার। এই ইনি—” ভরতরকে দেখিয়ে— “বোঁজ করতে এসেছিলেন... ইয়ে...”

“বলুন... বলুন... আপনার এখান থেকে যে মেয়েটি সেই পার্টিতে গিয়েছিল... বসুন... বসুন... উঠবেন না... এই ছবিটা তো তার। ঠিক বলছি?”

হির চোখে সরমা সরকারের নুটো এলাপার্ড ফোটোর দিকে তাকিয়ে ম্যানেকারনি বললেন— “একটা ভাবী হয়েছে... খুব পাতলা ছিল... বেত পাটার মতো... খুব লম্বা...”

“নামটা মনে পড়ছে? মনে করিয়ে দিচ্ছি... অঞ্জনা মল্লিক।”

“হ্যাঁ... হ্যাঁ।”

“আপনাকে এখন ছোট একটা কাজ করতে হবে। তাহলেই আমরা বিদেহ হবে। নইলে জানেন তো, পুলিশে খুঁলে আঠারো ঘা—”

“ভর সেখাজেন? কেস করে বরিশ যা করে ছাড়বে। আমার নাম কাত্যায়নী মণ্ডলা।”

একটা ছবি উলটো করে টেবিলে রাখল ইন্নাথ। মধুকরা কণ্ঠে বললে— “পেছনে শুধু লিখে বিন, ‘একে আমি তিনি। এর নাম অঞ্জনা মল্লিক।’ সেই করে দিন তলায়— ব্যাংকিউ।”

#### [১৫] নগরবধু নিকেতন

তিন ঘণ্টা আগে সুরেশ দে মহাপ্রায়ের টগবগে তেজোমুখ মূর্তি দর্শন করেছিল গাড়ির মধ্যে থেকে। “সেই আমি” ভাবটা এখন অস্তহিত হয়েছে বরতন থেকে। সর্বময় কর্তৃত্বের অনুশীলন বিজ্ঞবণও স্মিতি। দুই চোখের মণিতে চাশা সতর্কতা। দুঁদে বাড়ি এই সুরেশ দে। ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

আমরা এখন বসে আছি তার গিভিং রুমে। বেন রাজপুত-কক্ষ। দেওয়ালের আলমারি থেকে ওরু করে জানলারদরজার পর্দা— সর্বত্র রাজস্থানি চারুকলা বিবৃত। একটু উগ্র রঙের সমাবেশ বটে, তবে পুরোপুরি প্রাচ্য রুচি— পাশ্চাত্যের বাপস নেই এই ঘরে। নেই কোনও ফানিচারে।

মাত্র তিনটে ঘণ্টা। এইটুকু সময়ের মধ্যে বেন বরস বাড়িয়ে ফেলেছে সুরেশ দে। উষেণের কালিমা আত্মরপ বিছিয়েছে অহঙ্কৃত মুখচ্ছবিতে।

নিঃসন্দেহে টেলিফোন এসেছিল তথাগত যোবদশিয়ারের কাছ থেকে। ইন্নাথের সেদিনের তলত-পঙ্কতি যোমাক বিমানের মতোই পবনবেগে একটার পর একটা টার্গেট টাচ করে বাজিল। কোথাও কালেকশন করছে না, সাসপেন্সের দম নিতে সময় দিচ্ছে না। ইন্নাথের এহেন মূর্তি কখনও দেখিনি। কাইটার ও তিরকালই, কিন্তু সেদিন বেন মূর্তিমান প্রভঞ্জন হয়ে গিয়েছিল। বিধ্বংসী। বিতীর্ণবণ।

কাত্যায়নী মণ্ডলকে দিয়ে অঞ্জনা মল্লিকের ছবি আইডেনটিফাই করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসেছিল গাড়িতে। জরত চোপে ধরেছিল— “অঞ্জনাই যে সরমা, জানলি কী করে?”

জবাটা হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়— “প্রতিটি রোমকুশ দিয়ে নগরবধু নিকেতনের বানিশা বাবা একবার হয়, তার নগরবধু হয়েই থাকতে চায়। এ বড় পিঙ্কি পথ। আমি সেই আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জগ্নত করেছি। আমি মুগ্ধিত। অবশ্য পুরোপুরি নয়। মেয়েরা একটা বর্ষ ইন্নির কুপায় বুঝতে পারে কোন পুরুষের নজর তাদের দিকে। আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সেই চ্যানেলে ছুটিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ একটাই। রাত দশটার নিরাপদ আলর ছেড়ে যে নগরবধু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, সে নিচুর গাটাকা দিয়েছে এই নগরেরই কোনও এক নিকেতনে। নিরাপত্তার জাগরা কোনটা? যেখানে ঘটনটা ঘটেছে— সেই জাগরটা। পেট কি হোস্ট—এর বাড়িতে থাই নেয়? পুলিশের চোখের সামনেই সে আট বছর থেকেছে বাড়ির কাজের লোক সেজে। বাড়ির কবী বনে গেছে গৃহবাহীকে অশুষ্ক ব্র্যাকমেল করে। অর্ধেক বরসী হয়ে চমৎকার লিভ টুগেলার চালিয়ে গেছে। ছিল বহুজনের নগরবধু— হয়ে রইল একজনের। আমি একটু ইন্না জুগিয়েছিলাম বৈচিত্র্যের ফাতনা পেতে। বঁড়িশি গিলেছে...”

আমি উত্তর শুনে বলেছিলাম— “এটা অর্থম।”

অজানবদনে ইন্নাথ বলেছিল— “কুরুকুরের ধর্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি অর্থের আশ্রয় নেননি? পাণ্ডবরা কুষ্টিপুর বটে, কিন্তু আপো কি পাণ্ডব? উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন ছলাকলার কিঙ্কি প্রয়োজন আছে। তুকা মিটেছে চেয়েছিল নগরবধু— আমি সেই স্বযোগ নিয়েছি...”

“কুন্ডলা শীলের হত্যাকারীর নাম জানাবার জন্যে, আছে বলেছিল জরত— “সে কি এই নগরবধু?”

“সেবা বাক,” ইন্নাথ গাড়ির মধ্যে আর কথা বলেনি।

বলল বাড়ির মধ্যে। সুরেশ দে-র সামনে।

“টেলিফোন পেয়েছিলেন?”

“কার?”

“তথাগত যোবদশিয়ারের।”

ভাল ব্যাটিং করে গেল সুরেশ দে— “সে তো রোজই পাই।”

“কারণ আপনি কোশানির মেরুণও কুন্ডলা শীল মারা বাওয়ার এক বছর পরেই এই বাড়ির মালিক। চম্পা সাহার এনগেজমেন্ট রিং খুলে ফেলে দিয়ে তাকে বধু বানানো। একই সঙ্গে আইবুড়া বস-এর পার্মানেট নগরবধুর ব্যবস্থাও করে দিলেন— মহাজোটের বড় শরিক অশ্বরের অন্তরালে চলে গেল— কাজের ঘেয়ে হয়ে...”

“হোরাট ননসেন—”

“শাট আপ। তথাগতবাবু বাড়িতে এখনও যান তো... যেতেই হয়... কামধেনু যে... বাঁটে বন্ধিন দুখ আছে, দুয়ে যাবেন... না... না... উঠবেন না... গিগি কোথায়?... বলবেন না?... আমিই বলে দিচ্ছি... শনিং করতে গেছেন... তিনি এসেই তাঁকে আলাদা করে জেরা করা হবে... তিনিও তো মহাজোটের শরিক... তথাগতবাবু ওরান্নি দিয়ে সেবেন টেলিফোনে, সেটা আঁচ করেই এসেছি... যা বাবুছিলাম... প্রায়ই যখন যেতে হয় কামধেনুর কটোজে... তখন এই নারী রক্তটিকে দেখতেই হয়... দেখুন, দেখুন... তাই না?... ”

অঞ্জনা মল্লিক ওরকে সরমা সরকারের কটোগ্রাফ নুটো সুরেশ দে-র চোখের সামনে ধরেছে ইন্নাথ।

বিপুল ব্যক্তি একটু চুপসে গেছিল ইন্নাথের বন্ধ-ব্যক্তিত্বের থাকায়। কিন্তু সামলে নিল ছবির দিকে চোখ রেখে— “না চেনার কী আছে।”

“নামটা? নামটা বলুন।”

“সরমা।”

“সরমা সরকার?”

“হ্যাঁ।”

“সত্যি বলছেন?”



“হ্যাঁ।”

“কঠিন চিজ আপনি। হার্ডকোর ক্রিমিন্যাল। চোখের পাতা এখনও কাপেনি। কাঁচা মিথ্যে বলে যাচ্ছেন জিতে তিলমাত্র জড়তা না এনে। গুরুদেব!”

“আপনারা কি অশ্রমণ করতে এসেছেন?”

“পূজো করতে এসেছি— আপনার প্রতিভার জন্যে।— এই ব্ল্যাক বিউটির নাম তাহলে সরমা সরকার? পকেটে গীতা আনি, আনলে ধরিয়ে দিতাম। গীতা ছুঁয়ে বলতে পারবেন, এর নাম সরমা সরকার?”

এই প্রথম চোখের পাতা পর-পর দু'বার ফেলল সুরেশ দে। বললে একটু ক্ষীণ জোরে— “পারব।”

“তাহলে রৌরব নরকের দরজা খুলে গেল আপনার সামনে,” বলতে বলতে একটা ছবি উলটিয়ে পোছেন সিকটা দেখালো ইন্ডানাথ— “কী লেখা আছে? ‘একে আমি চিনি। এর নাম অঞ্জনা মল্লিক’— অঞ্জনা মল্লিক কে, সুরেশবাবু? আট বছর আগে যে কলগার্লকে ‘লেডিজ হোস্টেল’ থেকে বুক করে নিয়ে গেছিলেন ডিনার পার্টিতে ফ্রেন্ড বানিয়ে, কুন্ডলা শীল খুন হয়ে যাওয়ার পরের দিনই যাকে ড্যানিশ করে দিয়েছিলেন হোস্টেল থেকে রাত দশটায়— এনে ফেলেছিলেন কোথায়? ‘মরকত ভবন’-য়ে— সেই দিন থেকে বাড়িটার নাম হওয়া উচিত ছিল ‘নগরবধু নিকেতন’— সঁপে দিলেন কল্লতরুর ডালপালায়— যে ডালপালায় আপনারও বিচরণ অব্যাহত রইল— শুধু আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণে নয়— আতঙ্কের মুখচাপা দেওয়ার জন্যে... কিসের আতঙ্ক তাও বলতে হবে?... সব ফাঁস করে দেওয়ার আতঙ্ক... ঘুঘু কন্যা অঞ্জনা ওরফে সরমা একই ওড়না দিয়ে আপনাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নাচিয়ে যাচ্ছিল— এখনও যাচ্ছে— একজনকে মেরেছে... প্রয়োজনে আপনাদেরও মারবে... কাকে মেরেছে তাও জানেন না? কত আর ন্যাকা সাজবেন, সুরেশবাবু? কুন্ডলাকে... কুন্ডলাকে... গর্হিত কর্ম করেছিল বলেই অঞ্জনা কে উড়িয়ে দেওয়ার দরকার পড়েছিল... কেন করেছিল?... খারাপ কথাটা আমাকে দিয়েই বলাবেন?... মেডিক্যাল রিপোর্টে ধরা গেছে, ডিনার পার্টি থেকে বেরনোর আগে কুন্ডলাকে... আপনারা যখন ডিনার রুমে... কুন্ডলা তখন তথাগতবাবুর প্রাইভেট চেম্বারে... অঞ্জনা নাকি লেডিজ টয়লেটে ছিল— তথাগতবাবুকে কি বলে গেছিল অঞ্জনা? কেউ যায়? কোনও মহিলা পুরুষকে বলে ‘টয়লেটে যাচ্ছি’? না... মিথ্যে কথা... অঞ্জনাও ছিল প্রাইভেট চেম্বারে... প্রাইভেট পার্টি মানেই একটু ফুটিফাটা— আপনারা তিনজনে— আপনি, চঞ্চল সেন, আর চম্পা সাহা সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন বস—কে হাতে রাখার জন্যে— হেঁদার হিসেবে অঞ্জনা দ্য কলগার্লকে আপনিই পাঠিয়েছিলেন প্রাইভেট চেম্বারে... নারীত্বের চরম অবমাননার পর রাগে যেম্নায় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল কুন্ডলা— হয়তো ভয়ও দেখিয়েছিল— তখন



সবলা অঞ্জনা একটু হাতের ডোজ দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল—  
লজ্জা জিনিষটা হাতে উঠে এসেছিল হাতের কাছে ছিল বলে—খুলিতে  
আচমকা চোট... তার আগে বর্বরের সঙ্গে ধাত্তাঙ্কি—দুর্বল হাট আর সইতে  
পারেনি... উঠে দাঁড়ান কেন?”

মুখ লাল হয়ে গেছে সুরেশ দেব। হবই তো, কতক্ষণ আর এত অপমান  
একটা মানুষ সইতে পারে?

ইন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে মুখ খুলতেই দিল না—“আপনার গুরুদেব বসের  
মিথোর ঘর একটু শুনুন। উনি যখন প্রাইভেট চেম্বারে কুন্ডলা শীল-য়ের  
সঙ্গে, আপনারা নাকি তখন ‘ব্রিক্স’ খেলছিলেন, ‘ব্রিক্স’ খেলা কখন হয়,  
সুরেশ দেব? চাউনে। তাহলে তো অঞ্জনা মল্লিকেরও ‘ব্রিক্স’-য়ের খেলায়  
থাকা উচিত। উনি কিন্তু মুখ কসকে বলে ফেলেছেন—অঞ্জনা গিয়েছিল  
লেডিজ টয়লেটে। ডাম লায়ার! অঞ্জনা, কুন্ডলা, বস—তিনজনেই ছিল  
প্রাইভেট চেম্বারে। আপনারা তিনজনেই একই সাফাই গিয়েছেন স্টেটেমেন্টে—  
নটা নাগদ বস-য়ের দেওয়া চার হাজার টাকা ব্যাংকে ঢুকিয়ে গলায় স্কার্ফ  
জড়িয়ে, ফিফটি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেছিল কুন্ডলা। মিথো... মিথো... সব  
মিথো... কুন্ডলার ডেডবডি গাড়িতে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল  
ফিফটি—অত্যাচারের সময় স্কার্ফ খুলে পড়েছিল ঘরে—সেইসঙ্গে ব্যাগ—  
এই দুটো নিয়ে যাওয়ার কথা মনে ছিল না... সঙ্গে গেছিল আর একটা  
গাড়ি... কে চালিয়ে নিয়ে গেছিল সেই গাড়িটা, সুরেশবাবু? আপনি, না  
বস? বলবেন না... বেশ... বেশ, সেই গাড়িতে ফিরে এলেন দুজনে...  
ফিফটি রইল পড়ে জগৎপুরে। স্কার্ফ আর ব্যাগ দেখতে পেলেন ‘মরকত  
ভবন’-য়ে ফিরে। আর তো ডেডবডি কাছে যাওয়া যায় না... চম্পট  
দেওয়াই সম্ভব। তাই করলেন আপনারা চারজনে... আপনি, চম্পল সেন,  
চম্পা সাহা আর অঞ্জনা মল্লিক। তথাগতবাবু—গভীর রাতে বাগানের পাথর  
খুঁড়ে চাপা দিলেন দু-দুটো পঞ্জিটিত প্রফ, ব্যাগ আর স্কার্ফ!”

শুধু কথা দিয়ে তৈরি প্রলয় ঝড়ের প্রতিক্রিয়া তো খটবেই। ঘটাতেই  
চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ রক্ত। সুরেশ দেব-র আদমস্তক এখন কাঁপছে। বিক্রম  
উবে গেছে। কাঁপতে কাঁপতেই বললে—“তাই যদি হবে তো ব্যাগ আর  
স্কার্ফ শুধু বাড়ি বেচতে যাবেন কেন? সরিয়ে নিবেন না কেন বেচবার  
আগে?”

মোক্ষম টাইট মেরেছে সুরেশ। টেলিফোনে তথাগত যা শিখিয়ে  
দিয়েছেন, কথা বলার প্রথম সুযোগেই তা তড়বড়িয়ে বলে গেল।  
ইন্দ্রনাথ শুধু একটু দম নিল।

[১৬] নাপার-নাপারীর নাপারদোলা

দরজার কাছে শোনা গেল প্যানিক-ঠাসা নারী কণ্ঠ—“এসব কী?”  
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল ইন্দ্রনাথ—“মিসেস চম্পা দেব? নমস্কার... নমস্কার...  
চলুন পাশের ঘরে... কেসটা কী? কুন্ডলা শীল... আট বছর আগে যে  
কেসটা দ্বন্দ্ব বাড়ি ফিরতে পারেনি পাটি থেকে।”

মেরুকর্তব্যবিমুদ চম্পাকে আড়াল করে পায়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে  
দরজা বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ।

ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। মুখ বিজয়দুস্ত। সে তুলনায় চম্পা দেব বিবর্ণ।

এক সেকেন্ডও সময় দিল না ইন্দ্রনাথ। ঠুসে ধরল সুরেশকে কথার  
ব্যুৎস-তে—“আপনার প্রশ্নের জবাবটা দিতে এলাম, সুরেশবাবু। তথাগত  
যেখ দস্তিদার আপনাকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, ব্যাগ আর স্কার্ফ  
পাওয়া গেছে। আপনার ওয়াইফ তখন মার্কেটিংয়ে ছিলেন—তাই জানতেন  
না। আমিই জানিয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে জেনে নিলাম, আপনার প্রশ্নের  
জবাব,” ফের একটু দম নিল ইন্দ্রনাথ—“বাড়িটা আপনি বেচেছিলেন।  
আপনাকে পাওয়ার অফ অ্যান্ডার্নি দিয়ে আপনার বস বিদেশ গিয়ে  
বসেছিলেন। তাই পাথর চাপা ব্যাগ আর স্কার্ফ সরানো যায়নি। আপনি  
জানতেন না। ক্রিমার? মেন কালগ্ৰিট তাহলে আপনার বস আর আপনার  
কলগার্ল স্কেড। চললাম তাদের কাছে। জয়ড—তুই এখানে থাক, ফোন  
করতে দিবি না। ফোন এলে ধরবি না। অভয়ভরবাবু, আপনি কইভলি  
আসুন। যুগাঙ্ক—”

আমাকে আর বলতে হলো না। এই খুনের ভিড়ে ইন্দ্রনাথের সান্নিধ্যই  
একমাত্র নিরাপদ।

তখন সব সন্ধে নেমেছে। তথাগতর কুঁবের-কটেজ কুন্ডলা-কটেজের  
মতো আলো বিতরণ করছে। বাগানের রাস্তার দু'পাশে সারবন্দী মর্মর-  
সুন্দরীদেব শরীরে শরীরে হ্যালাজেনের ফেঁকাস ফেলা হয়েছে। জানলায়  
জানলায় কাঁট গ্রাসের ঝিকিমিকি আচ্ছন্ন এক আলোক-কুহক সৃষ্টি করে

চলেছে।

আমরা ঢুকলাম বসবার ঘরে সরমা সরকারকে সঙ্গে নিয়ে। দরজা  
খুলেছিল সে। বৈদ্যু চোখে সেকেন্ড শানেক চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথের হীরে-  
চোখের দিকে। এখন তার পরনে টেলার-মেড চিলেটালো মিশকালো নাইট-  
নকল হীরে বসানো জারগায় জারগায়—হাজার রোশনাই ঝলকিত হচ্ছে  
এক-একটা নকল হীরে থেকে।

তথাগত বসেছিলেন হুইল-চেয়ারে। শাভ মুখচ্ছবি। মাথার ওপর জ্বলছে  
ঝাড়বাতি। যেন সাধা মোমমূর্তি।

প্রথম কথা বলল ইন্দ্রনাথ—“অভয়ভরবাবু, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।  
যুগাঙ্ক—এখুনি আসছি।”

বেরিয়ে গেল বৈদ্যু-নয়না আর ভয়ঙ্কর পাত্রকে নিয়ে। তারপর যা  
ঘটেছিল, তা পরে শুনেছিলাম।

পার্শ্বের ঘর।

ভয়ঙ্কর পাত্র দাঁড়িয়ে আছে দানোর পাওয়া মূর্তির মত, মুখ ভাবলেশহীন।  
আবাধা কালো চেহারার মধ্যে শুধু চোখ দুটোই একটু বেশি লাল হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ আর সরমা বসল পাশাপাশি—সোফায়। দুজনে দুজনের চোখের  
দিকে চেয়ে চকমকির ঝিলিক তুলে গেল সেকেন্ড কয়েক, তারপর খুব নরম  
গলায় ইন্দ্রনাথ বললে—“তুমিই অঞ্জনা।”

জবাব নেই। চাহনি নিম্পলক।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে ফটোগ্রাফ দুটো বের করে দেখাল ইন্দ্রনাথ—  
“তোমার ছবি?”

জবাব নেই।

একটা ছবি উলটে শেখান দিক দেখালো ইন্দ্রনাথ। মুখে বললে একই  
কথা—“তুমিই অঞ্জনা।”

ছবির দিকে চেয়ে রইল অঞ্জনা মল্লিক।

ইন্দ্রনাথ বললে—“কাত্যায়নী মণ্ডল যখন আইডেনটিফাই করেছেন,  
তখন আর অস্বীকার করে লাভ নেই। তলার লিখে লাও—হ্যাঁ, এই ছবি  
আমার। আমি অঞ্জনা মল্লিক। আমি সরমা সরকার।”

“কলম দিন,” গলা কাঁপল না অঞ্জনার।

ঝট করে ঝুঁকে পড়ে বুক পকেট থেকে উঠে পেন টেনে এগিয়ে দিল  
ভয়ঙ্কর।

ঘরে ঘরে লিখল অঞ্জনা, হাত কাঁপছে। লেখা শেষ হল। সই-ও হল।  
অঞ্জনা মল্লিক একটু থমকে রইল। চোখ নামিয়েই রয়েছে। সইয়ের তলার  
লিখল—“আমি এক বারবধু।”

নিম্নে স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে—“নিম্নে যা করো, কুন্ডলাকে ওই পথে  
নামাতে গেলে কেন?”

ঝট করে মুখ তুলে ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রাখল অঞ্জনা। কিছু বলল না।  
হিপনোটিক চাহনি মেলে ঘরে ইস্ত কিছু বললে পেল—“রাজি হচ্ছিল না?”

“না,” গলা ভেঙে গেছে অঞ্জনার।

“তারপর ভয় দেখিয়েছিল?”

“হ্যাঁ।”

“তখন মারলে?”

“হ্যাঁ।”

“কী দিয়ে?”

“ভেনাসের মার্বেল মূর্তি দিয়ে। টেবিলে ছিল।”

ফিরে এল ইন্দ্রনাথ, ভয়ঙ্কর আর অঞ্জনা।

মোমমূর্তি তথাগত একটুও নড়লেন না। শুধু তাকালেন অঞ্জনার দিকে।  
বাঁধায় চাহনি। অঞ্জনা বললে—“আমি সব বলেছি।”

ইন্দ্রনাথ বললে সঙ্গে সঙ্গে—“মরকত ভবন” আপনি বেচেননি,  
তথাগতবাবু। বেচেছিলেন সুরেশ দেব। উনি জানতেন না, কুন্ডলা নিধনের  
পর আপনি ব্যাগ আর স্কার্ফ পাথর চাপা দিয়েছিলেন বাগানে। জানলে  
সরিয়ে নিতেন না।”

জবাব দিলেন না তথাগত যোষদস্তিদার। শুধু দাঁতে দাঁত ঘষলেন। কট  
করে একটা শব্দ হল মুখের মধ্যে। মাথা খুলে পড়ল বুকুর ওপর। চোখ  
এখন বন্ধ।

এতক্ষণ নীরব ছিলেন কেন, সে রহস্য প্রাঞ্জল হয়ে গেল।

দাঁতের ঝাঁকে রেখেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল।

অঙ্কন: ইন্দ্রনীল ঘোষ